ZID

Anthology of eight stories translated from Marathi to Bengali
by Bommana Viswanatham

প্রথম প্রকাশ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক : পি. চট্টোপাধ্যায় ৫৫ মহাত্মাগান্ধী রোড কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক : তারা প্রেস ৪৪ স্থধীর চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ৬

সূচী

দু কথা

ইংরেজ শাসনের গুণেই হোক আর আমাদের পরাধীন মনোবৃত্তির জন্যই হোক আমরা বিদেশকে যতটা জেনেছি, দেশকে ততটা জানা হয়নি, বরং দেশের সঙ্গে ক্রমেই জীবনের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আজও যে এই অবস্থার শেষ হয়েছে তা বলা চলে না। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতটা ওয়াকিবহাল এমন বোধকরি আমরা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও নয়। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে পাশের দেশ চীনসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের যোগ বোধকরি তার শতাংশ। নরওয়েজিয়ান অনেক লেখকের নাম আমাদের কণ্ঠস্থ কিন্তু একজন তামিল, তেলুগু, কন্নড, মালয়ালম, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটী, মারাঠী বা ওড়িয়া, অসমীয়া সাহিত্যিকের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। অথচ আমাদের না জানার আড়ালে এই সব সাহিত্যও দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে মারাঠী ভাষায়। কয়েক বছর আগে মারাঠী ভাষা থেকে আমার অনূদিত আন্নাভাউ সাঠের মঙ্গলা উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ায় অসংখ্য পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘটনায় অণুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান গল্পসংকলন প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছি। আমার বিশ্বাস বাঙালী পাঠক পাঠিকাদের কাছে গল্পগুলি ভাল লাগবে। বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীমনু সেন ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

৬২ নিমতা রোড কলিকাতা ৫৬

একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনী

আন্না ভাউ সাঠে

জল থেকে তোলা মাছের মত যমুনা বিছানায় পড়ে ছট্ ফট্ করছে।

আজ আবার তার মানস চক্ষুর সামনে স্মৃতির তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে। তার অবস্থা পঙ্কে নিমজ্জিত প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কা খাওয়া নৌকোর মত। তার মনের পাখি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে দ্রুত গতিতে উড়তে উড়তে সুখ দুঃখের দিনগুলির দিকে উঁকি মারছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল সমস্ত পৃথিবীর মত মহারাষ্ট্রেও তার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে। হাজার হাজার যুবকদের মত জয়সিংহও যুদ্ধে গিয়েছিল। নিজের সুন্দরী স্ত্রী যমুনা এবং কোলের শিশু অশোককে বৃদ্ধ বাবার রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যায়।

গাঁয়ে যুবকদের সংখ্যা ভীষণ ভাবে কমে গেল। রোজগারে ভাঁটা পড়ল। গাঁয়ের সেই সৌন্দর্য যেন লোপাট হয়ে গেছে। জীবনের গান থেমে গেছে। কৃষকদের লাঙলের মুখে মরচে পড়েছে। মেহনতী মানুষেরা কাঁধে তুলে নিয়েছে বন্দুক!

দিনকয়েক পরে মৃতদের বস্ত্র আর চিঠি গাঁয়ে সমানে আসতে থাকে। চৌকাঠে মাথা কুটে কাঁদে মায়েরা বোনেরা। পল্লীর প্রতিটি বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের করাল ছায়া। যুদ্ধ দাঁতে ঠোঁট চেপে থেমে গেছে!

কামানের মুখে বৃদ্ধের একমাত্র ছেলে, অন্ধের যষ্ঠি জয়সিংহকে জীবন দিতে হয়েছে। যমুনার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে।

অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণায় বিক্ষোভ আর বিরক্তিতে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে যমুনা, 'আর কত দিন এই জ্বালা সহ্য করতে হবে।'

কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব কোন দিন সে কারো কাছে চায় নি। কাজে যেত গতরে খাটতো, ফিরে আসতো, রান্না করতো সবাইকে খাওয়াতো আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে ঘুমিয়ে পড়তো। এইভাবেই কেটেছে দিনের পর মাস। মাসের পর বছর। দীর্ঘ দশটি বছর!

গত দশ বছরের হাজার হাজার রাত্রের মত আজও যমুনা বিছানায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। তার দৃষ্টি অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে কাকে যেন খুঁজছে। মাঝে মাঝে যেন তার দম আটকে আসছে। সারা গা ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

ছেলের মিলিটারি ওভারকোট জড়িয়ে তার শ্বশুর শুয়ে আছে। যমুনার দৃঢ় বিশ্বাস তার এখনও ঘুম ধরেনি। তার দিকে তাকিয়ে যমুনা মনে মনে প্রার্থনা করে যেন খুব তাড়াতাড়ি সকাল হয়। তার ঠোঁট ব্যাকুলতায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। 'আমি যা চাইনা তাই শ্বশুরের ভাল লাগে!' বিড় বিড় করে বলে যমুনা।

বাইরের পৃথিবীতে রাত্রি পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে। অন্ধকার সেই গ্রামকে কালো ওড়না দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। বোকা লোক যেমন হঠাৎ কোন এক জায়গায় বসে পড়ে ঠিক তেমনি তাদের গ্রামও একটি বেয়াড়া জায়গায় বসে আছে। এক পাহাড়ের নীচে হাজার হাজার খোপরের মত তাদের গাঁ। সেই পাহাড়ের উচ্চ শিখরের স্তম্ভে বড় লাল আলো ত্রিশ মাইল দূর থেকে বায়ুজানকে বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে। আর সেই লাল আলোয় তাদের গ্রাম যেন আধুনিক জগতে থাকা মধ্য যুগের বস্তি। মুখ গোমড়া করে পড়ে আছে।

সেই বস্তির মাঝে একটি ডোবা। সেখানকার অধিবাসীরা তাতে স্নান থেকে শুরু করে প্রাণ পর্যন্ত দেয়। ডোবার ধার ঘিরে ব্যাঙের কর্কশ শব্দ ভেসে আসছে। তাদের সেই শব্দ শুনে মনে হয় যেন

আজ পর্যন্ত সেই ডোবার জীবনের অসহ্য জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যারা ডুবে মরেছে তাদের সকলের আত্মা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করছে, 'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক।'

বৃদ্ধ তার বউমা এবং নাতিকে নিয়ে সেখানে থাকে। সকালে যমুনা কাজে চলে গেলে বৃদ্ধ মিলিটারি কোট পরে লাঠির অগ্রভাগ অশোকের হাতে তুলে দিয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়ত। তার ঘাড় সব সময় সোজা রাখত। অন্ধদের মত হাতড়ে হাতড়ে চলতো না। শরীর প্রশস্ত। উঁচু নাক। ভরা গাল। সব সময় উঁচু হয়ে থাকত চুল। সব কিছু মিলিয়ে তাকে অদ্ভুত দেখাতো। বেশ প্রশস্ত চেহারা এবং তার উপর মিলিটারি ওভার কোট থাকার ফলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হত। যখন কেউ জানতে পারে যে সে অন্ধ তখন তাকে দুচার পয়সা দেয়। দেওয়ার সময় স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধ সেই দাতার দিকে মুখ ফেরায়। দাতা দেখতে পায় সেই ওভার কোটের বুকের উপর লেখা নম্বর মারাঠা ইন্সপেক্টর।'

এই মিলিটারি কোটটি বৃদ্ধের কাছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান। এটা তার বীর ছেলের স্মৃতি জাগরুক রাখছে। এটাকে সে খুব যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে আসছে। লোকে বৃদ্ধকে হাবিলদার বলে ডাকতো আর গাঁয়ের গুণ্ডারা তাকে শয়তান বলতো।

একদিন যমুনাকে কাজ থেকে ফেরার পথে দেখে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটি যুবক জোরে জোরে গান গায়—'পাতলি কামার হ্যায়, তিরছি নজর হ্যায়·।'

এই বিশ্রী ধরনের ব্যবহারের কথা বৃদ্ধের কানে যেতেই সে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবকের ঘরে গিয়ে তাকে বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আমি গরিব, আমাকে বিপদে ফেলনা।'

'আমি তোমার বউমার কি করেছি?' সেই ছেলেটা খুব রেগে গিয়ে বলে।

• বৃদ্ধ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঐ যুবকের দিকে তাকায়। সে বলে

যায়, 'আমি তো নিজে নিজেই গান গাইছিলাম। আমার গান বন্ধ করার তুমি কে হে? কোথাকার কে লাটসাহেব এসেছে।'

বৃদ্ধ ক্রোধে জ্বলে ওঠে। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ তার কান ধরে খুব জোরে নাড়া দেয়। সে বিছের কামড় খাওয়ার মত ছট্‌ ফট্‌ করলে কিছুটা ঢিল দিয়ে বৃদ্ধ বলে, 'রাজকুমার, কই এখন আর একবার গাও দেখি।'

ছেলেটির কান খুব ব্যথা করে ওঠে। হঠাৎ তার মুখ হাঁ হয়ে যায়। নিজে নিজেই গালে চড় কষে, বলে 'না না আর কোন দিন গাইব না।' ধীরে ধীরে বলে ওঠে। কিন্তু সে আওয়াজ বৃদ্ধ শুনতে না পেয়ে আবার শক্ত করে ধরে কানটাকে। তখন ঐ ছেলেটা লক্ষ্য করে ভাবে যে বৃদ্ধ অন্ধ এবং কিছুটা কালাও হয়ত হবে। শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে নিরুপায় হয়ে বলে, 'না দাদু আমি আর কোনদিন ঐ ধরনের কাজ করবো না। এই বারের মত আমাকে ছেড়ে দাও।'

কান ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলে, 'আমার বউমার পেছনে আর কোনদিন লেগেছিস কি জিভ ছিঁড়ে ফেলব!'

যমুনা কিছুটা অস্থির হয়ে ওঠে। এই ঘটনা স্মৃতিপটে ভেসে উঠতেই তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। সে বৃদ্ধের দিকে তাকায়। বৃদ্ধ তখনও জেগে আছে। তার স্মৃতিপটে যমুনার সুন্দর পবিত্র জীবনের অসংখ্য ছবি ভেসে উঠেছে। বৃদ্ধ সেই অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে বসে বিড় বিড় করে বলে ওঠে, 'যমুনা গোবরে পদ্মফুল।' সেই ফুল তুলে নেওয়ার লোভ অনেকরই আছে। সেই লোভকে রুখবে কি করে! তার সামনে না হোক পেছনে অনেকে তাকে 'মজাদার মাল' বলে…যদি কিছু হয়ে যায় তো…বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কি সব চিন্তা যেন তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধাক্কা দিচ্ছে।

অর্ধনিদ্রাচ্ছন্ন মানুষের মত তার মনকে কে যেন নিজের ইচ্ছা

মত চালনা করে চলেছে। সে কি সত্যি কোন না কোন দিন চলে যাবে। সে যদি যেতে চায় তো তাকে বাধা দেবে? তার মনের প্রদীপ যেন সেই প্রশ্ন নিভিয়ে ফেলে। ফলে তার মন যেন গহন অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। আর তার চিন্তা ভাবনা যমুনার তেজস্বী চরিত্রের চারদিকে যেন ঘুর পাক খাচ্ছে। কিন্তু চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকের চিন্তা সত্বেও তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বাস্তবতা যেন চিৎকার করে বলছে, 'সে রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফেরে··· মিছামিছি চটে যায়···কাঁদে···গম্ভীর হয়ে বসে থাকে···না খেয়ে অনেকদিন পড়ে থাকে···এ সব কিসে জন্যে—?'

কিছুক্ষণ পর সে একজন চিন্তাশীল মানুষের মত নিজে নিজেই বলে উঠল, সে যে সুন্দরী, জোয়ান। নিজের যৌবনের তাতানো লোহায় আর কতদিন এই ভাবে মর্চে ধরতে দেবে? এ সব আমি বুঝি! উপায় বা কি? এই বিরাট জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা ধারে কাছেও যেত না। থেমে যায়। থামতে পারে না। গতকালের ঘটনা তার মনে পড়ে।

যমুনার ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। সে তার পথ চেয়ে বসে ছিল। বৃদ্ধ কোটের ভিতর নিজের শরীরকে গুটিয়ে রেখে চিন্তা ভাবনায় ডুবে থাকে। অশোকের প্রতীক্ষারত চোখে ক্লান্তি নেবে এসেছিল। সে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় গোড়ালি তুলে তাকাল।

'কি রে আসছে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

'না।' অশোক চেয়ে থেকে জবাব দেয়।

'ভাল করে দেখ, আসছে হয়তো।' বৃদ্ধ স্বর তুলে বলে।

অশোকও চটে গিয়ে বলে, 'না আসছে না।'

এর পর দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত অশোক নিরাশ হয়ে বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পড়ে। সকরুণ কণ্ঠে সে তাকে প্রশ্ন করে, 'মা কোথায়?'

বৃদ্ধের স্বর আটকে যায়। দলা পাকায়। কথা সরে না। বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা।

ঠিক এই সময়ে ঐ বিল থেকে আওয়াজ এলো। একটা হৈ চৈ হচ্ছিল। কে-যেন একজন চিৎকার করে বলল—'আত্মহত্যা···!'

কে আত্মহত্যা করেছে? বৃদ্ধের হৃদয় যেন খান খান হয়ে যাচ্ছে। তার গোটা শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। অশোক কাঁদতে শুরু করে। দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে বৃদ্ধের মন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইথারে ভর করে আতরের সুগন্ধ ভেসে আসার মত যমুনার কণ্ঠস্বর এলো, 'অশোক!'

অশোক মার বুক জড়িয়ে ধরে, বৃদ্ধের মন শান্ত হয়। থপ করে সে বসে পড়ে মাটিতে।

যমুনা ঘরে আলো জ্বালে। বৃদ্ধের মনে হল যেন এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবী হঠাৎ শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। যমুনা আপন মনে রান্না করতে শুরু করে।

অনেকক্ষণ বৃদ্ধ অন্যমনস্ক ছিল।

'আসতে খুব দেরি করলে।' অনেকক্ষণ পর সে তার মুখ খুলল।

রান্নার কাজে খুব ব্যস্ত থেকে যমুনা বলে, 'আজ জনসভা ছিল। কারখানার সবাই গেল। আমিও তাদের সঙ্গে চলে গেলাম।'

এ কথা শুনে সে চুপ করে যায়। কিন্তু অশোক হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'কিসের সভা মা?'

'আর যাতে যুদ্ধ না বাধে তারই জন্য বাবা। বুঝলে? আর এই কথা শুনে সব বুঝে নাওয়ার মত অশোক মাথা নাড়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর যমুনা বিছানা পাতে। অশোক নিজে নিজেই কি যেন বক বক করছিল। ঐ সব কথা শুনে যমুনা হাসছিল আর বৃদ্ধ দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

অশোক মার কাছে গিয়ে বসে বলে, 'মা, তুমি কিসের কাজ কর?'

'রঙের কাজ।'

দাদুও তাহলে ঐ কাজ করে না কেন?' অশোকে আবার প্রশ্ন করে।

'উনি যে চোখে দেখতে পান না বাবা।'

'মিথ্যা কথা। ডাহা মিথ্যা। বাবাকেতো ঠিক দেখতে পেতেন।' অশোক যমুনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে।

কথাটা শুনেই যমুনা চেপে হাসে। নাতির এই অদ্ভুত কথা শুনে দেবারও হাসি পায়।

এরই মধ্যে অশোক দারুণ চটে গিয়ে বলে, 'যাও যাও আমি আর কাল দাদুর সঙ্গে ভিক্ষে করতে যাবো না। আমার পা ব্যথা করে।' কথাটা বলেই মার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়। আর যমুনা সারা বিশ্বের সম্পদ তুলে নেওয়ার মত ছেলের পা হাতে তুলে নিয়ে কোলে রেখে টিপে দেয়। খুব আদরের সঙ্গে মা বলে, 'তা হলে তুই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে কাজ কর।'

'যাও যাও আমি কাজ কর্ম কিছুই করবো না।' যমুনা খুব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'কাজ করবি না তো কি করবি?'

'আমি যুদ্ধে যাব।'

'যুদ্ধে যাব!'—এই কথা বিদ্যুৎবেগে যমুনার কানে ঢোকে। আনন্দ উচ্ছ্বসিত তার মন হঠাৎ বিষিয়ে ওঠে। ঠাস করে তার গালে চড় কষে দেয়! অশোককে খুব দ্রুত কাছে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ বলে, 'ওকে মারছ কেন?'

'মারবো না তো কি পূজো করবো। এই ধরনের ছেলেকে তো মারাই উচিত!' যমুনা খুব ক্রোধে বলে।

কথাটা শুনেই দেবার শরীর রাগে ফুলতে থাকে। বিক্ষুব্ধ বাঁদরের মত তাকাতে লাগল সে। তার চোখের সাদা ছানিটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। বলে ওঠে, 'মার দিকি, কি রকম মার?'

'বেশতো এবার না হয় আমাকেই মেরে ফেল না কেন!' যমুনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে। তার কান্নার আওয়াজ শুনে

বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা মাটির মত বৃদ্ধের মন গলে যায়। তার সমস্ত রাগ যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ মিলিটারি কোট পরে নিয়ে শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ কুঁড়ে ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

বৃদ্ধ জেগেই ছিল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা বলল যমুনা কি কখনও যেতে পারে। মানুষ এবং পাথরের মধ্যে কতটা পার্থক্য? মানুষ জগতের সমস্ত জীবের চেয়েও বেশী চিন্তা করে। চিন্তা করে বলেই মানুষ। না হলে জানোয়ারই হতো। তারপর মনে মনে এই কথার স্বপক্ষে প্রমাণ খোঁজ করে। সাতটি সন্তানের মায়া ছেড়ে ঐ এলাকারই এক মহিলা আত্মহত্যা করেছে···যমুনা তো এখনো জোয়ান! শুধু একটি সন্তানের মা! কি করে বলা যায় যে তার মনে অন্যায় কজের চিন্তা ঢুকবে না! অন্যায় কাজ···অন্যায় তো সবাই করছে। ···তার চিন্তা সেখানেই থেমে যায়। আর অগ্রসর হতে পারে না···অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়।

সে উঠে যমুনার দিকে তাকায়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে। নিস্তব্ধ ঘরে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

যমুনাও চিন্তার রাজ্যে ডুবে আছে। বিভিন্ন চিন্তার তার মাথায় তোল পাড় খাচ্ছে। সেই জন্য সে হাত বাড়িয়ে অশোককে বুকের কাছে টেনে নেয়।

'তুমি কাল আমাকে এই জায়গাতেই মেরেছ!' ভোরে গালে হাত বুলোনোর সময় মার হাত ধরে অশোক বলে ওঠে।

'তুই বা বলতে গেলি কেন যে যুদ্ধে যাব।' বুকে আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে যমুন বলে।

অশোক কোন উত্তর দেয় নি। দেখে শুনে যমুনা বিড়বিড় করে বলে, 'যুদ্ধ খুব খারাপ বাবা, তোকে কোলে ফেলে তোর বাবা সেই যে কত বছর আগে যুদ্ধে গেছে আর ফেরেনি।···আর ফিরবেও না কোন দিন!'

'তা হলে আমি যুদ্ধে যাব না, মা। আমি কি ছাই এ সব জানতাম।'

'তা হলে আমিও তোকে কখনোও মারবো না, বাবা।'

ভোরের হাওয়া খুব স্নিগ্ধ। দ্রুত গতিতে প্রবাহিত। বড় বড় মেঘের টুকরোগুলো বিচিত্র ধরনের আকৃতি ধারণ করে আবার সরে যাচ্ছে।

সেই বস্তির লোক জেগে গিয়ে নিজেদের কাজে লেগে যায়। মেহনতী মানুষের স্নায়ুতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত। যমুনাও উঠে পড়ে।

অশোক বলে, 'মা ঐ ডোবায় কে মারা গেছে?'

'কে জানে কে মরেছে। তুই এখানে থাক কোথাও যাসনি যেন একা' অশোক প্রশ্ন করে 'কিন্তু কেন মারা গেল মা?'

'জীবন তার কাছে অসহ্য লেগেছে বলেই মারা গেছে।' যমুনা বিরক্তিতে বলে ওঠে।

'তা হলে আমাদের দাদু বেঁচে আছে কেন?'

যমুনা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। 'আমাকে আর জ্বালাস্‌নি। চুপচাপ ঘুমো।'

যমুনার এই আচরণ দেখে বৃদ্ধের মনে হলো যেন তাঁর নাম কেউ করলেই যমুনার রাগ ধরে। এর জন্য তার খুব রাগ হয়। বিড় বিড় করে সে বলে, 'আমার নাম শুনলেই না জানি কেন লোকের এত রাগ!'

যমুনা এ কথা শুনেও না শোনার ভান করে নিশ্চুপ থাকে। এই নিরুত্তর ভাব বৃদ্ধের কাছ আরো অসহ্য লাগে। আবার সে বলে ওঠে, 'এখন দেখি মুখে কথা সরে না! আমার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এত রাগের কারণ কি?'

'কি বলব, কিসের জন্য বলব? আমাকে আর জালিও না বলে দিচ্ছি!' কিছুক্ষণ চুপ করে আবার যমুনা, 'এই ছেলেটা সব সময় খালি যুদ্ধে যাওয়ার কথাই বা বলবে কেন? আর তুমিই বা দিনের পর দিন আমার সামনে···

'বল, বল, আমি কি করেছি বল না। বল আমি কি করেছি দিনের পর দিন···বল !'

বিগত দশ বছর ধরে যত জ্বালা আর বিক্ষোভ তার মনে জমে ছিল সব কিছুর আক্রোশে বলে ওঠে যমুনা, 'গত দশ বছর ধরে, প্রতিটি দিন, আমি আমার হতভাগ্যের কথা ভুলতে চেষ্টা করেছি আর তুমি প্রত্যেকটি দিন আমার মনের সেই ক্ষতকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।'

'আমি ? আমি তোমার ক্ষতকে বাড়িয়ে দিচ্ছি ?' অবাক হয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, তাই। গত দশ বছর ধরে আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। আর তুমি তাতে সাহায্য করছ। প্রত্যেকটি দিন আমি চেষ্টা করি ভুলতে আর তুমি প্রত্যেকটি দিন তা স্মরণ করিয়ে দাও। বুঝে শুনে তুমি ঐ মিলিটারি কোটটা আমার সামনে তুলে ধরে আমাকে জ্বালিয়ে মারছ !'

যমুনা বিক্ষোভে আর আবেগে দেশলাই কাঠি জালে। ভোরের আলো তখনও তাদের কুঁড়ে ঘরে ঢোকেনি।

ঐ কুঁড়ে ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়ে। বুড়োর মগজেও সেই আলো যেন কিছুটা ঢোকে। অসহায় স্বরে বৃদ্ধ বলে, 'আমি জেনে শুনে তা করিনি বউমা। আমার বীর ছেলের এই টাইতো একমাত্র স্মৃতি ! তাই আমি একে যত্নের সঙ্গে রাখি। তোমাকে জালানোর জন্য নয়। কিছুতেই নয়। তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ঠিকরে ঠিকরে পড়ে। গুমরে ওঠে তার মন। গায়ে ঐ কোটটা জড়িয়ে পাগলের মত বিড় বিড় করে সে বলে, 'আমি আমার বউমাকে গত দশ বছর ব্যথা দিয়ে আসছি···আমার আর···না কিছুতেই না··· !'

'হাবিলদার মশাই কি হল কি ?' ঐ কুঁড়ে ঘরের সামনে চিৎকার শুনে সমবেত লোকেরা প্রশ্ন করে বৃদ্ধকে।

'আমি খারাপ লোক। আমাকে ছেড়ে দাও।' বৃদ্ধ ভীড়ের বুক

চিরে পথ করে নিয়ে টলতে টলতে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে যায়।

'আরে ধরো ধরো ওকে ধরো। হাবিলদার মশায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে!' সারা গাঁয়ে মুহূর্তে হৈ চৈ পড়ে যায়। কয়েকজন জোয়ান মজুর ঐ ডোবার কাছে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে ধরে ফেলে। যমুনাও ছুটে সেখানে পৌঁছে যায়। অশোকও মার পেছনে ছুটে যায়।

'ছেড়ে দাও আমাকে। আমি নিজের হাতে বউমাকে বিষ খাইয়েছি। গত দশটি বছর ধরে আমি তার মনের ক্ষতকে খুঁচিয়ে দিয়েছি। আমি তাকে বিষ খাইয়েছি! আমাকে ধরোনা তোমরা! আমাকে ছেড়ে দাও!' বলে চিৎকার করতে করতে গা থেকে ঐ কোটটা নাবিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঐ ডোবায়। সমবেত জনতা অবাক হয়ে যায়।

'আমি তো ভেবে ছিলাম হাবিলদার মশাই আত্মহত্যা করবেন।' ভীড় থেকে একজন বলে ওঠে।

'বল কি হে! আমি কি পাগল হয়েছি যে আত্মহত্যা করব? আমি কি একলা যে আত্মহত্যা করলেই হলো। আমায় নিয়ে তিন তিনটি জীবন আছে। আমার আত্মহত্যা করলে চলবে না! বাঁচতে হবে বুঝলে! আমাকে বাঁচতে হবে!' বলেই বৃদ্ধ অশোককে কোলে তুলে নিয়ে নিজের কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পূব দিগন্তে লাল টুকটুকে সূর্য যেন দিনের কপোলে রক্ত রাঙা তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর চার দিকে দ্রুত গতিতে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে।

জিদ

গাঙ্গাধর গোপাল গাড়গিল

লোকে লোকারণ্য স্টেশন। নিজের প্রকম্পিত হাত দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছে এক বৃদ্ধ। তার অন্য হাত ধরে পাশাপাশি দ্রুতগতিতে চলেছে এক বৃদ্ধা। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাদের। জীবনের বোঝা যেন আর টানতে পারছে না। বুড়ির ঘোলাটে চোখে কৌতূহল আর জিদের কোন চিহ্ন নেই। যে-কোনভাবে সে এগিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজছে। তার ঐ পথচলার মধ্যে আছে জিদের একটি ছাপ। চুল পেকে গেলেও একটা কিছু আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করে সেই আওয়াজের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, আর এই প্রয়াসের প্রতিফলন পড়ে তার চেহারায়। প্রত্যেক মুহূর্তে যেন সে কথা বলতে চায়। বার বার তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কথা না বলে আর থাকতে পারল না। হঠাৎ চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'আচ্ছা আপদ রে বাবা, লোকগুলো কি সবসময় কোন না কোন জায়গায় যাচ্ছেই। এদের যাওয়ার আর বিরাম নেই!'

'আঃ, কি বলছ তুমি?'

'আমি বলছি দেশের লোকগুলো সবসময় কোন না কোন জায়গায় যাচ্ছেই। এদের যাওয়ার আর শেষ নেই।' বৃদ্ধা এত জোরে এই কথা বলে যে ভিড়ের হৈ-চৈ ছাপিয়ে তার তীক্ষ্ণস্বর আশপাশের যাত্রীদের কানে বাজে। বৃদ্ধ কিছুটা বিরক্তিতে বলে, 'আরে, একটু আস্তে কথা বলো না।'

'আমি তো আগে আস্তেই বলেছিলাম। শুনতে না পেয়ে তুমিই

তো আবার বলতে বললে।' বৃদ্ধা নিঃসঙ্কোচে ঠিক আগের মতই জোরে জোরে বলল।

'বুঝলাম। কিন্তু অত জোরে কথা বললে লোকে কি ভাববে?' বৃদ্ধ বিড়বিড় করে এমনভাবে কথাটা বলল যেন কেউ স্পষ্ট শুনতে না পায়। এইভাবে বৃদ্ধ নিজের রাগ তখনকার মত চাপা দেয়। সব সময়ের মতো তখনও সে জেনেশুনেই হার মেনে নেয়।

'ভাববে আবার কি? আর ভাবলেই বা ওদের কথায় আমাদের কি যায় আসে?' বৃদ্ধার একই উচ্চস্বর, একই নিঃসঙ্কোচভাব।

এর পর গাড়িতে ওঠার সময় এগুতে এগুতে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা বলে, 'এগোও না। থেমে গেলে কেন?'

তার এই ধরনের মাতব্বরি সব সময় লেগেই আছে। বৃদ্ধ বলে, 'সামনের লোক না সরলে আমি এগোব কি করে! কত ভিড় দেখছ না!'

'ভিড় হলে হয়েছেটা কি! আমরা এগোতে শুরু করলে আপসে রাস্তা হয়ে যাবে।' বলেই হঠাৎ এগিয়ে দরজার কাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। 'আরে, একি! ...কই...!'

'এই শুনুন! আমি কিছুই দেখতে পাই না। আমাকে ধাক্কা দিলে পড়ে যাব। আর উঠতে পারব না। আমাকে একটু পথ করে দিন। কি? আপনার বাচ্চার চোখে আমার আঙ্গুল ঢুকে গেছে! কিন্তু আপনিই বলুন না, আমার কি দোষ? আমি যে কিছুই দেখতে পাই না।'

লোকে বকুনি দিল বটে কিন্তু রাস্তাও করে দিল। বৃদ্ধার পেছনে পেছনে বৃদ্ধও ট্রেনে উঠে পড়ল।

'তোমার সব তাতেই এত তাড়াহুড়োর কি আছে বুঝি না। আমাদের সীট তো রিজার্ভ করাই আছে।' বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বলে।

'তাড়াহুড়ো না করে উপায় কি? প্ল্যাটফর্মে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি গাড়ি আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে?' বৃদ্ধা পাল্টা প্রশ্ন করে।

কথা শুনে ঘাড় নেড়ে তার কথা শুনতে থাকা এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ মুচকি হাসে। তার সেই হাসিতে কোন আওয়াজ হয়নি। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধা বুঝতে পেরে বলে, 'তুমি আমার কথায় হাসছ ? হাস। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। যাক আমাদের বসার সীট কোথায় ? চলো আগে নিজেদের সীটে বসি। পরে আবার সীট নিয়ে না ঝগড়া করতে হয়।'

আবার সেই তাড়াহুড়ো ? স্ত্রীর এই ব্যবহারে হঠাৎ বৃদ্ধের মেজাজ বিগড়ে গেল। ধমক দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু দেওয়া আর হলো না। চুপ করে রইল বৃদ্ধ। তার হাত ধরে সীটে নিয়ে গেল। তার ব্যস্ততার সঙ্গে তাল রেখেই যেন তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তার সীটে বসিয়ে দিল।

ভাবল সীটে চুপচাপ বসে থাকবে। এতক্ষণ ভিড় ঠেলে ঠেলে বৃদ্ধ খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটু শান্তিতে দম নিচ্ছে সে।

কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে সীট হাতড়ে হাতড়ে দেখে নিয়ে বলে, 'আমাদের এই জায়গাটা শুধু দুজনের জন্যই তো ?'

'হ্যাঁ। কেন, এখনও কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে ?'

'অসুবিধা আবার কি ? জানা রইল, আর কেউ এখানে বসতে চাইলে বসতে দেব না। তা না হলে একটু পরেই কেউ হয়তো এসে তোমাকে একটু সরে বসতে বলবে আর তুমিও অমনি সরে গিয়ে নিজেদের সীটে তাকে বসিয়ে নেবে।'

'জায়গা থাকলে লোকে বসতে চাইলে বসতে দেব না !'

'লোকের চিন্তা আর তোমাকে করতে হবে না। নিজেরা নিজেদের চিন্তা করে নেবে। গুটিসুটি মেরে বসে তোমার শরীর ব্যথা করলে কি আর লোকে তোমার শুশ্রূষা করতে আসবে ?'

ক্রমাগত সে বকবক করে যাচ্ছে। বৃদ্ধের মনে হল যেন তার কানের কাছে বসে কেউ ভাঙা কাঁসর বাজাচ্ছে। অথচ বৃদ্ধা যেন ক্রমাগত দারুণ উৎসাহ, উদ্দীপনা আর বলিষ্ঠতার সঙ্গে দুনিয়ার সব

আপদ-বিপদ দুহাতে সরিয়ে দৃপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চাইছে। অপর পক্ষে বৃদ্ধ চায় বিশ্রাম। জীবনের বোঝা আর টানতে পারছে না। স্বস্তিতে দুদণ্ড বসতে চায় নিরিবিলিতে। তাই সে কথার সমাপ্তি টানতে বলে, 'আরে না, ও কথা আমি তোমাকে বলছি না।'

'কিন্তু ঐ কথাই তো তোমার বলা উচিত ছিল। আসল কথা তো ঐটাই।' বৃদ্ধা চিৎকার করে বলে।

তারপর ঘাড় কাত করে চুল এলিয়ে দিয়ে চুলে শীর্ণ হাত বুলোতে থাকে।

দেখতে না পাওয়া চোখ হঠাৎ কিছুটা দেখতে পাওয়ার মতো বিস্ফারিত করে বলে, 'সত্যি কথা একটা বলব? লোকে আমাকে অন্ধ, অসহায় ভাবে। কিন্তু আসলে আমিই তোমাকে সামলে নিয়ে চলি। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার একটুও চলতে পারে না।'

সেই ফ্যাসফ্যাসে স্বরে সে বলে যাচ্ছে। অন্য কোন স্বরে সে যেন কথাই বলতে পারে না। সেই স্বরেই সর্বক্ষণ তার বকবক করা চাই। চুপ করে থাকলেই যেন তার জিদে ভরা ব্যক্তিত্বে ঢিল পড়ে যাবে।

কথাগুলো সব সময়েই কাঠখোট্টা এবং কর্কশ। কিন্তু হঠাৎ এই কর্কশ আওয়াজ মিহি সুরে পরিবর্তিত হয়ে থেমে গেল। তার হাতের আঙুলগুলো স্বামীর হাতে পড়তেই।

স্ত্রীর হাতের ছোঁয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরও যেন ভালই লাগল। পরস্পরের হাতের স্পর্শে পরস্পরের মনে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করল। এই স্পন্দন অতীতের একটি স্মৃতির সূত্রে টান দিল। মনে পড়ে—সেদিনের কথা। দুপুর। নির্জন পথ। কত কথা ছিল। বলতে পারছিল না। সেদিন একটা হাত সহজে এসে পড়ল তার হাতে। সেদিন কত মজবুত করে ধরেছিল সেই হাতকে।

'বলব তোমাকে? বলব? মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছা করে জান? ইচ্ছা করে তোমার পাশে বসে গল্প করতে করতে এইভাবে তোমার কোলে মাথা রেখে মরে যাই।'

কিন্তু যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনই অকস্মাৎ যেন সেই দূরস্মৃতির রঙীন ধূপের ছায়া মিলিয়ে গেল।

একটু অবাক দৃষ্টি মেলে স্ত্রীর দিকে বৃদ্ধ তাকাল। স্ত্রীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, অতীতের কোন স্মৃতি তার মনকে তোলপাড় করছে।

কিছু হয়তো তোলপাড় করছে না। কি যেন কান পেতে শুনছে। কিসের যেন লোভ তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ আঁচল দিয়ে নাক মুছে, ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে, থুথু ফেলে বলে, 'কি যেন এসেছে বিক্রি করতে?'

বুঝতে পেরেছে যে আইসক্রীমওয়ালা এসেছে। আজ কদিন ধরে পরোক্ষে কোন জিনিস কিনতে বলার অভ্যাস দেখা দিয়েছে।

আইসক্রীমওয়ালার আওয়াজ পাওয়ার পরই যেন তার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু একটা খাওয়ার জন্য বাচ্চাদের মতো ছট্‌ফট্‌ করছে। তার জিভে আইসক্রীমের স্বাদ।

বৃদ্ধার মনে পড়ল, মামার বাড়িতে একবার আইসক্রীম হয়েছিল। সেদিন তাকে আর যমুনাকে মামা দ্বিগুণ আইসক্রীম দিয়েছিল। অনেকক্ষণ তারা খেয়েছিল। তারপর যে রেকাবে করে আইসক্রীম দিয়েছিল সেটা সে চেটেছিল অনেকক্ষণ।

পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর আগের সেই স্বাদের ছোঁয়া যেন আজ আবার জিভে পেল।

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'আইসক্রীম এসেছে। কেন, তোমার চাই নাকি?'

বৃদ্ধ লক্ষ্য করছে, আজ কদিন হল স্ত্রীর এই রোগ দেখা দিয়েছে। যা আসে তাই খেতে চায়। কিনতে অনুরোধ করে।

'ধ্যেৎ, তুমি যে কি বল! আমি কি এখনও বাচ্চা মেয়েটি আছি নাকি যে আইসক্রীম খাব?'

'খেতে চাও তো বলো, কিনে দি!' বৃদ্ধ স্বামী বলে।

কথাটা শুনেই ফিক করে হেসে ওঠে বৃদ্ধা। আইসক্রীম পাওয়ার ব্যাপারে যেন তার কোন সন্দেহ ছিল না।

আজকের এই ফিক করে হাসাটা যেন ঠিক সেদিনের হাসির মত। বাসর ঘরে অনেকখানি ঘোমটা টেনে শেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে মাথা তুলে যে ধরনের হাসি হেসেছিল আজকের হাসিও তারই স্মারক।

আজকের হাসিতেও সেই লাজুক ভাব। সেই মিটমিটে চোখের চাহনি। বৃদ্ধ এক পেয়ালা আইসক্রীম কিনে স্ত্রীর দিকে ধরে অভিভাবকের স্বরে বললে, 'অনেক হয়েছে। নাও, আর ঢং করতে হবে না। ধর আইসক্রীম!'

বৃদ্ধা সসঙ্কোচে নিয়ে নেয় সেই পেয়ালা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন তার সঙ্কোচ কেটে গেল। এখন সে আইসক্রীম খাওয়ায় ব্যস্ত। খেতে খেতে হঠাৎ মাথা তুলে দেখতে না পাওয়া চোখ মেলে বলে, 'তুমিও খাওনা আইসক্রীম। বেশ ভাল লাগছে।'

কিছুক্ষণ আগেকার সেই অভিভাবকী স্বর আর রাখা যায়নি বেশিক্ষণ। আবার যেন বৃদ্ধ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আগের মত প্রত্যুত্তরে বিড়বিড় করে সে বলে, 'আমি চাই না। আমার ইচ্ছে নেই খাওয়ার।'

'ইচ্ছেটা নেই কেন? না, আজকাল তোমার যেন কোন কিছুতেই ইচ্ছে নেই।'

'দেখ আজ আমি বুড়ো হয়েছি, এ কথা ভুলে যাও কেন?'

'সব সময় খালি 'বুড়ো হয়েছি বুড়ো হয়েছি', জগতে যেন আর কেউ বুড়ো হয় না! একবার আইসক্রীম খেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে শুনি!' স্বামীকে যেন ধমক দেয় বৃদ্ধা। অল্প বয়সে তার বোন যমুনাকে ঠিক এইভাবেই ধমক দিত। যমুনাও ঠিক এই পদেরই ছিল। কোন কিছুতেই এগোতে চাইত না। সবটাতেই যেন খুঁতখুঁতে ভাব। তার এবং যমুনার এই পারস্পরিক বিপরীতধর্মী চরিত্র থাকার ফলেই তাদের মধ্যে দিনে দশবার ঝগড়া হত। অর্থাৎ দশবার মিলনও হত।

কিন্তু পরবর্তী যুগে যমুনার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা

দিল। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর নার্সের কাজে যোগ দিয়ে সে হয়ে উঠলো খুব মুখরা। আর এদিকে বৃদ্ধা চোখের মাথা খাওয়ার আগে রান্নাঘরে মাথা গুঁজে কাজ করে যেত।

বৃদ্ধা একমনে চুসচাস করতে করতে আইসক্রীম খাচ্ছে। বৃদ্ধ তার দিকে বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। অতীতের অনেক কিছুই যেন মনে পড়ছে তার। হঠাৎ মনে হল বৃদ্ধা যেন বদলে গেছে। এই সেদিনও সে যা ছিল আজ যেন তা নেই। গত তিন বছরের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

আইসক্রীম খাওয়ার জন্যে উচ্চস্বরে একনাগাড়ে অনেক্ষণ বকে যায় বৃদ্ধা।

হঠাৎ বৃদ্ধ বলে ওঠে, 'আজকাল তুমি খুব বদলে গেছ।'

'বদলাতে হল এই তোমার জন্যে। শুধু তোমারই জন্যে বদলাতে হল।' বৃদ্ধের ওই কথার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা এই জবাব দিয়ে আগের মতই আইসক্রীম শেষ করে নিয়ে পেয়ালা চাটতে থাকে।

বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কিছু কিনতে বলার সময় তার সলজ্জভাব বৃদ্ধের চোখের সামনে ভাসছে। তার দেখতে-না-পাওয়া চোখ যেন সব সময় ব্যস্ত স্বামী কি ভাবছে বোঝার জন্য, স্বামী কি চায় অনুভব করার জন্য। আগে বৃদ্ধার মধ্যে কেমন সুন্দর একটা বিনয় ভাব ছিল, আজ আর তা নেই। এখন সবকিছুই বদলে গেছে। কাঁধটা কেমন যেন সোজা হয়ে হঠাৎ বেঁকে গেছে। নাকের মধ্যে একটা ঋজুভাব জিদ ধরে উঁচু হয়ে আছে।

মনে পড়ে গেল একটি কথা। মহিলাদের যৌবনের শেষে, প্রৌঢ়তার প্রারম্ভে হঠাৎ তাদের আচরণ বদলে যায়। একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে চোখে চমক লাগে। মনে হয় যেন সে সব বুঝে গেছে। পরক্ষণেই বৃদ্ধ আর ওসব চিন্তা করতে চাইল না। আবার ঝিমোতে লাগল।

বৃদ্ধা তো বলেছে, 'তোমার জন্যে আমাকে বদলাতে হল।' তাকে

ঐভাবে আইসক্রীম চাটতে দেখে অতীতের অনেক কিছুই মনে পড়ে গেল বৃদ্ধের।

বিশেষ করে তার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। সে বাইরের ঘরে মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে আর বউমার বাপের বাড়ির লোক দেখা করতে এসেছে তার ইঞ্জিনীয়ার ভাই এবং তার বউ।

তার স্বামী বউমার ভাইকে 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। কথার ধরন দেখে বৃদ্ধা বাইরে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসে, গজগজ করতে করতে।

পেটে হাত চেপে বসে থাকে বৃদ্ধা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল যেন গোপন কথা হচ্ছে। তার খুব ইচ্ছা করল ইশারায় স্বামীকে বারণ করতে। বউমার ভায়ের সঙ্গে উনি যেন আর বেশি কথা না বলেন। ইশারায় ডাকে—এদিকে চলে এসো।

পরিণামে যা হওয়ার ছিল তা না হয়ে পারল না।

বউমা থপথপ করে পা ফেলতে ফেলতে ঘরে ঢুকে হঠাৎ শ্বাশুড়ীকে বলে ওঠে, 'আপনি ঐ ঘরে গিয়ে বসুন।'

হঠাৎ এমনভাবে বৃদ্ধা নীচে বসে পড়ে যেন তার পেটে কেউ প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরেছে। দুঃসহ অপমানের জ্বালায় বউ-এর উপর দারুণ চটে গিয়ে যেন সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। বৃদ্ধের নিজেরও মনে পড়ে না সে আর কি বলেছিল। তবে গজগজ করতে করতে সে যে সেখান থেকে সরে পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তৎক্ষণাৎ ধরে না ফেললে বৃদ্ধা হয়তো বউমার চোখ উপড়ে ফেলতো।

সেই মুহূর্তে সে বউমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। তারপর সন্ধ্যার সময় ছেলে ঘরে এলে তার সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল।

সেদিন নিজের আবেশে বিমূঢ় হয়ে সে বসে থাকে। তার বিশ্বাসই হয় না যে সবকিছু সে-ই করেছিল একদিন। বিয়ের পর থেকে এত বছরে সে কোনদিন ঐ ধরনের ব্যবহার করেনি। বউমার অনেক কিছুই

তো যে সহ্য করেছিল। বউমা আসার সমসাময়িক কালেই তার দৃষ্টি-শক্তি লোপ পেয়েছিল। কাজেই সংসারের যা কিছু ঝামেলা সব বউমার উপরেই সঁপে দিয়েছিল। নিজের কোন অধিকারই খাটানোর চেষ্টা করেনি। ভালমন্দ সবকিছু হজম করে যেত। তার স্বামীর সবকিছু ঠিকমত হচ্ছে জেনেই সে খুশী। তাছাড়া কোন বিষয়ে চোটপাট দেখানোর ইচ্ছা তার ছিল না।

কিন্তু বউমা সেদিন ঐভাবে কথা বলে সবকিছু ওলট-পালট করে ফেলল।

সত্যি কথা বলতে কি, ছেলে-বউকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর বৃদ্ধার সবচেয়ে ভাবনা হল, তাদের চলবে কি করে।

আবার সেই প্রশ্নই স্বামী করার পর বৃদ্ধা ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে, 'কেন, পেনশন তো পাচ্ছ, তাতে যদি পেট না চলে তো আমি না হয় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইব। লোকে তো অন্ধদের দু-চার পয়সা দান করেই থাকে।'

'টাকাপয়সার কথা তো ভাবছি না, ভাবছি···'

'ঘরসংসারের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য চাকর রাখব। না রাখতে পারলে আমি সবকিছু করব। তুমি শুধু উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দিও আর আমি বললে নামিয়ে দিও। ব্যাস।'

'কিন্তু—'

'বেশ তো, যাও তাহলে। বউমার হাতে পায়ে ধরগে। আমি এখানেই থাকব।'

এই প্রথম বৃদ্ধার মুখ দিয়ে ঝাঁঝালো কথা বেরুল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার এই কণ্ঠস্বর আর বদলাল না। রুক্ষ মেজাজ আর ঝাঁঝালো কথা।

তারপর সে অনেক ভেবেচিন্তে চিনল নিজেকে। বৃদ্ধার মনে হল যেন সারা জীবন সে একই পথে অগ্রসর হচ্ছে। মনে মনে একটি জিদ চেপে চেপে দিন কাটাচ্ছে। তার মনে হলো যেন তার স্বামী বদলে

যাচ্ছে। সে দিনকে দিন বৃষ্টিতে ভেজা মাটির মত যেন গলে যাচ্ছে। বারবার মনে হল যেন তার বাকি একক অন্ধ জীবনটা তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্যেই কাটাতে হবে। কার্যত তাই সে করেছে।

বেশি চিন্তা করারও তার সময় ছিল না। বিচার করার শক্তিও ছিল না তার। এক এক পা অগ্রসর হতে চেষ্টা করল নিজে নিজে। যেভাবে সে আজ পর্যন্ত ছিল, যে ভাবে তাকে রেখেছিল, সেই ভাবেই শেষ দিন পর্যন্ত চলা তার ইচ্ছা—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

দৃষ্টিহীন চোখের পাতা কয়েকবার ফেলে হঠাৎ অত্যুৎসাহে বৃদ্ধা বলে ওঠে, 'ছেলেটা হয়তো অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'গতবারে আমরা যখন পুনায় গিয়েছিলাম, অজিত সে সময় তোমার ধারেকাছে ছিল। বেড়ানোর সময়, খাওয়ার সময়, এমনকি ঘুমোতও তোমার কাছে।'

'আরে ধেৎ, সে কি আজকের কথা। কত বছর আগেকার বিষয় নিয়ে জাবর কাটছ!' অ্যাদ্দিনে হয়তো সে আমাকেই ভুলে গেছে। ছেলেপুলেদের আবার কথা কি! আজ এখানে মন বসলে, কাল বসবে ওখানে।'

'বাজে কথা বলো না, হ্যাঁ। ছেলেদের সব কথা মনে থাকে!' বৃদ্ধা এমনভাবে জোর দিয়ে বলল যেন তার বিরুদ্ধে মুখ নেড়ে কিছু বললে এক্ষুণি কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।'

'সত্যি কথা বলতে কি, শুধু শুধু—।' কিন্তু কিসের ভয়ে যেন আর কথা শেষ করে উঠতে পারল না বৃদ্ধ।

'কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি, ?' তার স্বরে আবার সেই ঝগড়াটে ভাব। বৃদ্ধ কোন জবাব দেয়নি।

এই তো তোমার বাজে অভ্যাস। প্রত্যেকটা বিষয়ে তুমি পিছু

হটো। তুমি তো ধরেই বসে আছ এখন আমাদের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষবে না। কেউ পুঁছবে না আমাদের। কিন্তু কেন পুছবে না, কেন শুনি? আমাদের কি কুষ্ঠরোগ হয়েছে যে ধারেকাছে ঘেঁষবে না? না কি অন্য কিছু হয়েছে?'

'আরে আসল কথাটা তা নয়। ডাকা নেই শোনা নেই, হঠাৎ যাই কি করে?'

'না—ডাকতে যাচ্ছি বলছ কেন? সে কি চিঠিতে লিখে পাঠায়নি, আপনারা চলে আসুন বলে?'

'তা লিখেছিল বটে। ওটা হয়তো একটা ভদ্রতার খাতিরে লিখতে হয় তাই লিখেছে। আমার হাত দিয়ে তুমি এমন একটা চিঠি লেখালে যে কি আর বলব। চিঠিতে বারবার ছেলেপুলেরা কেমন আছে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে। এমন কি আবার তাদের দেখার জন্যে মন তোমার কেমন করছে, তাও তো লেখাতে ছাড়লে না। ঐ ধরনের চিঠি পড়ে না ডেকে আর কি করবে?'

'তাতে হয়েছেটা কি? বাচ্চাদের দেখতে ইচ্ছে করছে তাই লেখা; তাতে এমন কি অপরাধটা হল বুঝি না। আর ডাকার মধ্যেও তো কোন খাদ দেখছি না। যতই হোক ছেলেটা তো পর নয়। তার ঘরে আমাদের যাওয়া থাকা এমন কি দোষের শুনি?'

'আরে কথাটা তা নয়, আমার কথা হল, মিছিমিছি কারো বাড়িতে আমরা যাব কেন?'

'আচ্ছারে বাবা, আমি না হয় কাঙালপনা করে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, হল? নাও, এবার চুপ কর।'

হঠাৎ যেন বৃদ্ধা দারুণ চটে গেল। এই বয়সে দু-একটি বাচ্চাকে কোলে বসাতে না পারলে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। নাতিনাতনীকে না দেখতে পারলে বাঁচা তার পক্ষে কষ্টকর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধাকে নীরবে কাটাতে হয়। দুজনে থেকেও যেন একক জীবন। ঘরসংসারে কোন কোলাহল নেই। এই নিস্তব্ধ জীবন ভাল লাগে না বৃদ্ধার।

তাই যখন তখন জোরে কথা বলে একটা ঝগড়া বাধিয়ে ঘরটাকে যেন সরগরম রাখতে চায়।

শেষ পর্যন্ত এতেও তার মনকে তৃপ্ত করতে পারল না। তাই আজ যাচ্ছে তার বউমার কাছে। সেখানে বাচ্চা-কাচ্চাদের মধ্যে ডুবে থাকতে পারবে। মনের সুপ্ত চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তির পর্যাপ্ত অবকাশের পর সে চিন্তা করল তাদের কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তারা। মনে মনে বৃদ্ধা যেন মাতব্বরি করে বউমাকে উপদেশ দিচ্ছে আর নাতিনাতনীদের কোলে বসিয়ে খেলাচ্ছে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ গা, নতুন মোটর কিনেছে, না?'

তার ইচ্ছা, স্বামী কিছু বলুক। সে চায় তার কল্পনাগুলো বাস্তবে রূপায়িত হবে বলে স্বীকৃতি পাক। সে যা এখন ভাবছে, তার স্বামী বলুক তাই হবে। বৃদ্ধা জানত ওদের অবস্থা তার চেয়েও তার স্বামী বেশী খবর রাখে। তাই সে চায় তার বাসনাগুলো রূপায়িত হবে কি না সে সম্পর্কে তার স্বামী নিজের মুখে কিছু বলুক।

'কে জানে!' তার স্বামী বলে।

'অর্থাৎ, আমি জিজ্ঞাসা করছি, সে মোটর নিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে আসবে তো?' সে নিজের উৎসাহ দমিয়ে দেয় নি।

'দেখা যাক কি হয়!' স্বামী বলে।

'তুমি অমন করে বলছ কেন? দেখো, নিশ্চয় আসবে।'

বৃদ্ধ কিছু না বলে নিশ্চুপ হয়ে গুটিয়ে বসে থাকে।

'তুমি চিঠিতে সব ঠিক মতো লিখেছো? কি গো? স্টেশনে আসতে লিখেছ তো ঠিক মত?'

'আমি লিখেছি—পারলে একবার স্টেশনে এসো।'

'পারলে একবার এসো কেন লিখলে? সোজাসুজি এসো লিখতে পারলে না? এতটুকু অধিকার কি আমাদের নেই!'

'আমাদের ওপর টান থাকলে ওতেই কাজ হবে। নিজেই আসবে।

'টান থাকবে না কেন শুনি?' বেশ জোর দিয়ে বলে বৃদ্ধা। তার ধারণা কোন কথা জোর দিয়ে বললে তাই সত্য হয়।

গাড়ি পুনা স্টেশনে এল। যে ব্যস্ততার সঙ্গে গাড়িতে উঠেছিল ততোধিক ব্যস্ততায় নামল। একই ভাবে কাউকে তোয়াক্কা না রেখে জোরে কথা বলতে বলতে। নেমেই স্বামীর পেছনে পেছনে না চলে এগিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। স্বামীকে বারবার জিজ্ঞেস করে, 'এসেছে? না? কই, দেখতে পাচ্ছ তাকে? না এসে সে কিছুতেই পারবে না।'

তাদের নিয়ে যেতে কেউ স্টেশনে আসেনি। ভিড় কমে গেলেও তার দেখা পায়নি তারা। বৃদ্ধ হঠাৎ মুষড়ে পড়ে। এর পর কি হবে তা ভেবে সে খুব চিন্তিত। আজ শনিবার, ওরা হয়তো সিনেমা দেখতে গেছে। এখন তারা তাদের ঘরে গেলে হয়তো চাকর দরজা খুলবে। আশঙ্কামাখা দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে হয়তো বৈঠকখানা ঘরে বসাবে। ছেলেপুলেরা তাদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাবে। ভয় পাবে। পরে আবার হাসবে। অর্থহীন হাসি। তাদের বলতে হবে আমরা তোমাদের জন্য এই দেখ মিষ্টি এনেছি। এই কথা শুনে তারা হয়তো আর হাসবে না। তবে মিষ্টিও নেবে না হাত পেতে। আমাদের পর ভেবে যেমনভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ঠিক তেমনিভাবে বেরিয়ে যাবে তারা।

বৃদ্ধ নিরাশ হয়ে বেঞ্চে বসে পড়ে ক্লান্তভাবে। ক্ষীণস্বরে সে বলল, 'তুমি অমন করছ কেন?'

'তোমার জন্য করছি গো! তোমার জন্য! লোকের সঙ্গে থাকতে, কথা বলতে তোমার ভাল লাগে তাই করছি। আমার মন চায় পাঁচজন তোমাকে সম্মান করুক। ছেলেপুলেরা তোমাকে ঘিরে থাকুক। তাই তো আমি অমন করি। তাই কান্না হয়েও নির্লজ্জভাবে এই জীবন কাটাচ্ছি গো। তোমারই জন্যে বেঁচে আছি গো! তোমারই জন্য!' ক্লান্তি মিশ্রিত আবেগে বৃদ্ধা বলে গেল সব কথা। হয়তো সত্যি কথাই বলছিল বৃদ্ধা।

বুকের ভেতর ক্রোধ, দ্বেষ, আর ঈর্ষা তোলপাড় করতে করতে যেন একসঙ্গে গলায় এসে আটকে গেল বৃদ্ধার। সংসারে বিশেষ করে তার স্বামীর জন্যই গুমরে উঠেছে সে। শুধু সে একাই রয়ে গেল তার আপন বলতে। তাই তাকে প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধা তার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের একটি বেঞ্চিতে মাথা রেখে উচ্চ আর কর্কশ স্বরে বীভৎস আওয়াজে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

সে যেন এক কুলভাঙা দুঃখের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তার মনে একটি ক্ষীণ আশা তোলপাড় করছে, 'সে আসবে। সে নিশ্চয় আসবে। তার ঘরে যাওয়ার অধিকার আমাদের আছে। নিশ্চয় আছে। পুরো অধিকার আছে।'

যৌবন

অনন্ত বামন ভাটি

মনে করুন, কোন প্রেমিকার প্রতীক্ষায় পরিষ্কার বিছানার উপর সেজেগুজে বসে আছেন। বার বার ঘড়ির দিকে দেখছেন আর দরজার কাছে ছুটে গিয়ে গোড়ালি তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাচ্ছেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বুকের ভেতরও টিপ্ টিপ্ শব্দ হচ্ছে। আর ঠিক সেই চরম মুহূর্তে যদি অন্য কেউ আসে তখন আপনার মেজাজ কি রকম হবে? আপনার যাই হোক না কেন এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

সুরেন্দ্র নলিনীর অপেক্ষায় বসে আছে। নলিনী কথা দিয়েছে ঠিক পাঁচটার সময় তার ঘরে আসবে। পাঁচটা বাজতে আর দেরি নেই। কারও মন পেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে পথ চেয়ে বসে থাকা উচিত। সুরেন্দ্র সাড়ে চারটে থেকে তৈরি হয়ে বসে আছে।

দরজায় কে যেন টোকা দিল, সুরেন্দ্র লাফিয়ে উঠল। নলিনী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। বহু প্রতীক্ষার পর অনেক বছরের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেন সে এখন পাবে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করল, বলবে, ঠিক সময় এসেছ। সত্যি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবাসো। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো মুখে আঠার মত আটকে গেল। আগন্তুকদের দেখে সুরেন্দ্রের মুখ লম্বা হয়ে গেল। চেহারার রং গেল পালটে। সামনে দেখতে পেল এক বুড়োর সঙ্গে বুড়িকে।

'আপনারা কাকে চান?' সুরেন্দ্র নিজের রাগ চেপে রাখার

আপ্রাণ চেষ্টা করে বলল। সে ভেবেছিল ওরা বাড়ির নম্বর ভুল করে এখানে এসেছে।'

'আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।'

তারপরেই বুড়ো সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। বুড়িও থপ্ থপ্ করে পা ফেলে সুরেন্দ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কোত্থেকে বুড়োবুড়ি হাজির হয়েছে কে জানে। সুরেন্দ্র ভেতরে ভেতরে দারুন চটেগেলেও ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে তা প্রকাশ করল না। আড়চোখে কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন।'

এই 'বসুন' শব্দটি এমনভাবে বলল যে একটু চালাক কোন লোক শুনেই বুঝতে পারত যে ওর মুখ থেকে যে 'বসুন' কথাটি বেরিয়েছে তার অর্থ 'চলে যান'। কিন্তু বুড়োটা হয় তা বুঝল না অথবা লোকটা ঘড়েল। সে বুড়িকে বলল, বসো না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ! তারপর নিজে একটি চেয়ারে বসল।

সুরেন্দ্রের কপালের রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হল। তার চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এর আগে বহুবার ওর এই ঘরে কন্যাদায়গ্রস্ত দম্পতিরা এসে বিরক্ত করেছে। তাদেরও সে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি কখনও। চলনে বলনে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আজকেও ভাবল, এরা নিশ্চয় বিয়ের কথা পাড়বে। হয়তো বলবে, তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল, তিনি আমার বন্ধু···ইত্যাদি। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, কি করি, কত মাইনে পাই ইত্যাদি প্রশ্ন।···যেদিন থেকে নলিনীর সংস্পর্শে এসেছে সেদিন থেকে সুরেন্দ্র বুড়োদের সঙ্গে কথা বলাই একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। তার অদ্ভুত একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে হলো নিজের সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায়না। এমনকি নলিনীদেরও সে কিছু জানায়নি। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব একটা জিদ আছে।

একদিন নলিনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার মাইনে কত বল তো?'

তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছে বলেই নলিনী এ প্রশ্ন করেছিল।

'কেন? মাইনে জেনে তুমি কি করবে? আমার মাইনের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? আমার মাইনের খবর জেনেই কি আমাকে বিয়ে করবে কি না, ঠিক করবে?'

অন্য একদিন নলিনী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কে কে আছে বল তো?' প্রশ্নটা শুনেই সুরেন্দ্র তেলেবেগুনে চটে গিয়ে বলল, 'কেন, তুমি আমায় বিয়ে করবে, না আত্মীয়দের কাউকে?'

কতবার কতভাবে তার সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করেও নলিনী ব্যর্থ হয়েছে। একটি কথাও বের করতে পারেনি। আর একদিন নলিনী বলেছিল, 'কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে চা খাবে?'

'এখন তোমার বাড়িতে যাব কেন?'

'যাবেনা কেন?'

'আগে বিয়ে হোক।'

'বিয়ে হয়ে গেলে তো তুমি জামাই হবে। তখন কি আর চা খেতে ডাকবো?'

'দেখ, তুমি আমাকে কচি খোকাটি মনে করো না। তোমার বাবার ওসব চালাকি আমি বুঝি। চা খাওয়ানোর বায়না করে, ডেকে পাঠিয়ে উনি, আমাকে দেখতে চান—এই তো?'

'দেখলেই বা ক্ষতি কি? ভাবী জামাই কেমন হবে তা কি একটু দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'কিন্তু আমাকে তো তুমি বিয়ে করবে। তোমার পছন্দ হলেইতো হলো।'

শত চেষ্টা করেও নলিনী তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে

পারেনি। সুরেন্দ্র নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলত, 'আমি তোমার সামনে বসে আছি। যতবার দেখার আমাকে দেখে নাও। কিন্তু আমার মাইনে ও আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করো না। ওসব কি আর আমাদের ভালবাসাকে গভীরতর করবে?'

নলিনী চুপচাপ থাকে। সুরেন্দ্র জিদ বজায় রাখতে চায়। কিন্তু সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠল। একদিকে সে কোন ক্রমেই নিজের পরিচয় দিতে চায় না। অন্যদিকে নলিনীর মা বাবাও তার সম্পর্কে কিছু না জেনে এ বিয়েতে মত দিতে রাজী নন।

অনেকদিন ধরেই সুরেন্দ্র বিয়ের প্রস্তাব করছে। আর দেরি করা উচিত নয়, কিন্তু নলিনী বলে. 'আমি তো বিয়ে করতে অরাজী নই, কিন্তু তুমিই তো জিদ ধরে বসে আছ।'

'জিদ তো আমি ধরে বসিনি। বসে আছেন তোমার বাবা।'

'কি করে? নিজের একমাত্র মেয়েকে কার হাতে তুলে দিচ্ছেন তার সম্পর্কে কিছুই কি জানতে ইচ্ছে করে না তাঁদের?'

'অতই যদি হয় তা হলে নিজের একমাত্র মেয়ে যাকে বিশ্বাস…'

'তোমাকে দেখছি বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সম্পর্কে তো আমি কিছুই জানিনা। বুঝি না কেন তোমার এই গোঁয়ার্তুমি।'

'নলিনী, এটা আমার গোঁয়ার্তুমি নয়, সিদ্ধান্ত। আমার নিশ্চিত মত হলো ভালবেসে যারা বিয়ে করে তার মধ্যে অন্য কারও নাক গলানো উচিত নয়। কাউকে সেই সুযোগ দিতেও আমি রাজী নই।'

তারপর থেকে উভয় পক্ষেরই অস্বস্তি বাড়তে লাগল। পরস্পরকে পেয়েও পায়না।

নলিনী কোন ক্রমেই বাবা মাকে রাজী করাতে পারেনি।

সুরেন্দ্র তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত সে কোনক্রমেই বিসর্জন দেবে না।

নলিনীর আসার সময় তো হয়ে গেছে। বিরক্তির স্বরে সুরেন্দ্র বলল, 'দেখুন আমি এখন বিয়ে করার কথা চিন্তা করছি না।'

বুড়ো হো-হো করে হেসে বলল, 'বাঃ চমৎকার। আপনি নিশ্চয় আমাদের কন্যাদায়গ্রস্ত ভাবছেন। তা ভাববেন বৈকি ?'

সুরেন্দ্র সান্ত্বনা পেল। বলল, 'তাহলে আপনি বিয়ের কথা নিয়ে আসেননি তো ?'

'আজ্ঞে না। অবশ্য আমার মেয়ে একটি আছে, তাকে নিয়ে বেরোনোও দায়—একবার যে ওর দিকে তাকায় সে চোখ ফেরাতে পারে না। কিন্তু এখন ওসবের প্রশ্নই ওঠে না। আজকালকার মেয়ে তো, নিজের জীবনসাথী নিজেই খুঁজে নিয়েছে। আমাদের শুধু আশীর্বাদের কাজটিই বাকি আছে।'

'নলিনী যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি কথাগুলো সেরে নিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুরেন্দ্র ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'এত কষ্ট করে কেন এলেন বললেন না তো?'

'আমরা এই লোকগণনা করতে বেরিয়েছি। দশ বছরে একবার আদম সুমারী হয় জানেন তো। আমরা জানতে চাই আপনার বয়স, জন্ম, বিষয়সম্পত্তি, চাকরি .....'

সুরেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আর কিছু বলতে সাহস করল না। রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আপনি যা কিছু জানতে চাইলেন তার একটিরও জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'বলার মত কিছু না থাকলে আপনি কি করে বলবেন। তবে এসব আমি নিজের স্বার্থে জানতে চাইছি না। দেশের স্বার্থে আপনার উচিত এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া। আমাদের রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুরোধ। দশ বছর অন্তর যে লোক গণনা হয়, তা আপনি নিশ্চয় জনেন। আমরা সেই কাজেই বেরিয়েছি।'

তারপর বুড়োটা ঝোলা থেকে ছাপানো কয়েকখানা ফর্ম বের করে প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম?'

'সুরেন্দ্র ভগবন্ত যোশী।'

'জাতীয়তা এবং ধর্ম?'

'ভারতীয় হিন্দু।'

'আপনি কি ব্রাহ্মণ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার গোত্র?'

'শাণ্ডিল্য।'

'আপনি কি বিবাহিত?'

'এখনও অবিবাহিত আছি।'

'এ সব প্রশ্ন ফর্মে আছে নাকি?'

বুড়ো হো-হো করে হেসে বলল, 'না এমনি।' পরক্ষণেই সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আচ্ছা আপনার বয়স?'

'পঁচিশ বছরে পড়েছি।'

'জন্মস্থান?'

'অমলনের পূর্বখান্দেশ।'

'আপনি কি বাস্তুহারা?'

'না।'

'আপনার মাতৃভাষা কি মারাঠী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কোন ভাষায় আপনি কথা বলেন?'

'প্রেমের।'

'এ আবার কোন দেশী ভাষা?······আচ্ছা যাক গে। দয়া করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন তো। নিজের পেট নিজে চালান, না অন্যের গলগ্রহ হয়ে আছেন?'

'আমি আত্মনির্ভর।'

'খুব ভাল কথা। আচ্ছা আপনি কি মালিক, না চাকর, না স্বাধীন ব্যবসায়ী।'

'কখনও মালিক, কখনও চাকর।'

'মানে?'

'আমি সবসময় স্বাধীনভাবেই চলি কিন্তু....কিন্তু—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বলুন, সঙ্কোচ করার কিছুই নেই। আমরা তো জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট নই যে ফাইন করবো।'

'আমি এক তরুণীর দাস।'

'বাঃ, আপনি তো মশায় বেশ লোক। প্রেমের ভাষায় কথা বলেন, তরুণীর দাস। যাক সে কথা। আচ্ছা, আপনার মাসিক আয় কত?'

'তিনশো।'

'অন্য কোন আয় আছে? অর্থাৎ আপনার দেশের বাড়িতে বিষয় সম্পত্তি জমিজমা।'

'দেশে হাজার ত্রিশ চল্লিশেকের বিষয় সম্পত্তি আছে।'

আপনি তো এখানে থাকেন—দেশের ওসব কে দেখে?'

'বাবা দেখেন।'

'আপনার ভাই বোন?'

'দুটি।'

'দুজনেই কি ভাই?'

'আজ্ঞে না। আমার একটি বোন আছে।'

'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এসব প্রশ্ন কি ফর্মে আছে?'

'তা অবশ্য নেই। বুড়ো হয়েছি তো মেয়ের সন্ধানে থাকি। ভাল পাত্র যদি পাই······'

'দয়া করে ওসব আপনাকে করতে হবে না। আপনার প্রশ্নগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিন।'

সুরেন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনার লেখাপড়া ?'

'বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-কম্. পাশ করেছি।'

'বেকার আছেন নাকি ? যদি থাকেন তো কতদিন ধরে ?'

'বেকার নই। কোনদিন ছিলাম না।'

'নারী না পুরুষ ?' ক্ষমা করবেন। ফরমে ছাপা প্রশ্নগুলো দেখে দেখে করছি তো তাই। না সত্যি আপনি ভাল লোক, বেশ ভদ্রলোক।'

তারপর সুরেন্দ্র পায়চারি করতে করতে এমন ভাব দেখাল যেন পরিষ্কার বলতে চায়, আপনারা বেরিয়ে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে বুড়ো বুড়িকে বলল, 'তোমার কোন প্রশ্ন নেই তো ?' বুড়ি ঘাড় নাড়ল।

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি অতি ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আপনার মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ধৈর্যশীল লোক খুব অল্পই আছে।'

তারপর বুড়ো যেতে যেতে বলল, 'আমরা এসে হয়তো আপনাকে অসুবিধায় ফেলেছি। এই সময় হয়তো অন্য কারুর আসার কথা ছিল। আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।···চল পাশের বাড়িতে যাই।'

ওদের চলে যাওয়ার পর সুরেন্দ্র আবার গোড়ালি তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাল। আশ্চর্য, নলিনী এখনও আসছে না। কিছুক্ষণ পরে আবার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, কতদিন আগে থেকে আজকের সাক্ষাতের কথা পাকা হয়েছিল···আজকেই তার বিয়ের মত দেওয়ার কথা। হয়তো বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে সাহস করছে না। অতীতের মত আজকেও হয়তো নানা অজুহাত খাড়া করে বলবে, 'দুদিন পরে বলবো, অত তাড়া কিসের ?' তারপর মুখ ভার করে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখতে পেল নলিনী আসছে। আজকে তার হাঁটার মধ্যে যেন নতুন একটি তেজ আছে। আছে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্র তার চোখ মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখে বলল, 'বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু এত দেরি করলে কেন ?'

'বিশ্বাস করো, এর জন্য আমি দায়ী নই। আমি তো চারটের সময় তৈরি হয়ে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় বাবা-মা আমাকে ঘর আগলাতে বলে কোথায় বেরিয়ে গেল। আমার ওপর হুকুম হল যতক্ষণ না তাঁরা ফিরে আসেন ঘরে ঠায় বসে থাকতে। তুমি তো জান ঘরে আর কেউ নেই। এ-অবস্থায় কি করি—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসেছিলাম।'

'তোমার বাবা-মা? সত্যি কথা বলতে কি জান, বুড়োগুলো আমাদের প্রত্যেকটি কাজে বাদ সাধে। তারজন্যই ওদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওদের ওপর আমার এই মুহূর্তে যে কি রাগ হচ্ছে!'

'কিন্তু এমন খবর এনেছি যে শুনলে তোমার রাগ জল হয়ে যাবে।'

'সত্যি? কি বলতো?'

'বাবা-মা তোমার সঙ্গে বিয়ে করার মত দিয়েছেন।'

'মত দিয়েছেন! আমি আগেই ভেবেছিলাম আমার জিদের কাছে ওঁদের মাথা নোয়াতে হবে। খুব তো তোমার বাবা চেষ্টা করছিলেন আমার পরিচয় জানার, কই পারলেন? শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হল।'

'এই মাত্র বাবা বললেন যে, তোমাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে।'

'কিন্তু উনি আমাকে দেখলেন কোথায়?'

'উনি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। নিজের চোখে তোমাকে দেখেছেন।'

'সুরেন্দ্র যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল, অসম্ভব?'

'তাহলে বাবার কাছে যা শুনেছি তা বলবো?··· তোমার মাসিক আয় তিনশো টাকা, তোমার গোত্র শাণ্ডিল্য, হাজার চল্লিশেক টাকার বিষয় সম্পত্তি আছে···আমার মনের মত আরওএকটি কথা জানি।'

'সেটা আবার কি? এসব জানলে কোত্থেকে?'

'তুমি প্রেমের ভাষায় কথা বলো। তুমি তরুণীর দাস।'

'এ্যাঁ।' সুরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। নলিনী হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল তার নরম বিছানায়।

সাইকেল

ভেঙ্কটেশ মাডগুলকর

মাসিক মাইনের একশো পঞ্চাশ টাকা পকেটস্থ করে স্কুলের চৌহদ্দি পার হয়ে ভার্গব মাস্টার ভাবলেন, রাজের জন্যে সাইকেলটা এমাসেই কিনে নি। কিন্তু সাইকেলের দাম দিতে কমপক্ষে দুশোটি টাকা গুণতে হবে। পুরোনো নিলেও কম করে একশো পঁচিশের নিচে কি আর হয়? সর্বসাকুল্যে দেড়শো টাকা যাঁর মাসিক আয়, পাঁচজনের একটি পরিবারকে যাঁকে প্রতিপালন করতে হয় সেই রকম একজন স্কুলশিক্ষকের পক্ষে একসঙ্গে অত টাকা খরচ করা কোনমতেই সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু উপায়ই বা কী? একমাত্র পুত্রের এই একটি মাত্র চাহিদাও এতদিনের মধ্যে তিনি পূর্ণ করতে পারেননি। আর এ শুধু তার চাহিদা নয়, আবশ্যকতাও বটে। কেবলমাত্র শৌখিনতার খাতিরে এত টাকা খরচ করতে হিসেবী ভার্গব মাস্টার কদাপি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজি ষষ্ঠশ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র রাজের পক্ষে একখানি সাইকেল নিতান্ত প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী। বোম্বাই-পুনা রোড থেকে ডকন-জিমখানা অর্থাৎ ভাবে স্কুল পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল রাস্তা রোজ তাকে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। বহুদিন পর্যন্ত ভার্গব মাস্টার নিজেও যে পায়ে হেঁটে অতদূর পড়াতে গেছেন, তা সত্য। কিন্তু বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপের বৃদ্ধির আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে এখন তাঁকে যাতায়াতের পেছনে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। এতদূর হেঁটে যেতে হয় বলে রাজও কোনদিন কোন রকম অভিযোগ করেনি। কিন্তু সময়মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে অতখানি রাস্তা পায়ে হেঁটে স্কুলে পৌছানো বেচারা রাজের পক্ষে প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রান্না করতে মায়ের একটু দেরি হলে

রাজ খুব অস্থির হয়ে পড়ে। রান্নাঘর থেকে বাইরের ঘরের ঘড়ি পর্যন্ত জায়গাটুকুতে বারবার সে ঘুর ঘুর করতে থাকে। তাড়াহুড়ো করে মা তাকে খেতে দেন আর কোন কোন দিন শুধুমাত্র ভাত আর আচারে সন্তুষ্ট হয়ে স্কুলে যেতে হয় তাকে। এসব সত্ত্বেও অভিযোগের একটি শব্দও কোন দিন তার মুখ থেকে বের হয়নি। বয়সের চেয়ে সে যেন একটু বেশি সমঝদার ছেলে। কথাপ্রসঙ্গে দু-একবার সে জানিয়েছে, 'একটি সাইকেল কিনে দিলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।' ছেলের কথা শুনে মা বলেছেন, 'বাবা, তোমার বাবা ধনী বা জমিদার নন। টিউশনি করে এবং পাঁচজন সহৃদয় মানুষের সাহায্য পেয়ে তিনি নিজের পড়াশুনো চালিয়েছেন। তাই এ কাজটি পাওয়া গেছে। কিছু বকেয়া পয়সা-কড়ি হাতে আসছে এখন নিজের কাপড়খানা ইস্ত্রি করার জন্যে পর্যন্ত দুপয়সা উনি খরচ করেছেন বলে আজ পর্যন্ত আমার জানা নেই। তুমি তো আজ আর অবুঝ নও বাবা! নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ভাবনা চিন্তা এখন তোমার হওয়া উচিত। হেঁটে গেলে পা দুটো তোমার ক্ষয়ে যাবে না।' এরপর আর কোন দিন সাইকেলের উল্লেখ পর্যন্ত রাজ করেনি। কিন্তু মাস্টার মশায়েরই থেকে থেকে মনে হয়, যে-কোন প্রকারে খরচ বাঁচিয়ে ছেলেকে একখানা সাইকেল কিনে দেওয়া দরকার। বোম্বাই-পুনা রোডের এক বড় বাংলোর আউট-হাউসের বাসিন্দা ভার্গব মাস্টার। সকালসন্ধ্যায় কর্মস্থলে যাতায়াত-কারীদের অসংখ্য চলমান সাইকেল দেখে তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য একটি সাইকেল কিনে দিতে না পারার অক্ষমতাজাত ব্যথার তিনি পেতেন। প্রত্যেকদিন এপথ দিয়ে হাজার হাজার সাইকেল-আরোহীর যাতায়াত। আলাদা আলাদা মডেল, পৃথক পৃথক মেক। নতুন, পুরোনো, কত সাইকেলই না এই পথ ধরে হাজারে হাজারে দৌড়ায়, তাঁর বাড়ির সামনে দিয়েও যায়। দুধ দেয় যে-গোয়ালা সে আসে সাইকেলে চড়ে। ছেঁড়া কাগজ আর শিশি-বোতলের খরিদ্দার, ছেঁড়া

কাপড়পরা লোকটা পর্যন্ত সাইকেলে করে আসে। এই বাংলোর পায়খানা সাফ্ করে বেঁটে মতো যে মেথরটা, এমন কি তারও একটা ঝক্‌ঝকে নতুন রেসিং সাইকেল আছে। অপর পক্ষে তিন মাইল দূরের স্কুলে প্রত্যেক দিন যাতায়াতকারী তাঁর ছেলের একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সাইকেলও নেই। ভার্গব মাস্টারের বুকটা জ্বলে যায়, মনটা হয়ে ওঠে চঞ্চল এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই কথা পেড়ে ছেলেকে তিনি বলেন, 'কি পড়ছ, বাবা রাজ? সংস্কৃত? গুড্! সংস্কৃতে এবার আশী পার্সেন্ট মার্ক তোল, পুরস্কার স্বরূপ তোমায় একটা সাইকেল নিশ্চয় কিনে দেবো।'

রাজ সংস্কৃতে সত্যি সত্যিই আশী পার্সেন্ট মার্ক পেলো। সাইকেলের দাবীটা সে কিন্তু ভুলেও একবার বাবার কাছে তুলল না। মাস্টার-মশাইও কথাটা বেমালুম এমনভাবে চেপে গেলেন, যেন ওপ্রসঙ্গে কোন কথাই কখনো হয়নি। নিজের প্রতিশ্রুতির কথাটা যে তিনি ভুলে গেছেন তা নয়। স্মরণে ঠিকই আছে কিন্তু তিনি যে নিরুপায়, আর বলবেনই বা কি? বাধ্য হয়েই তাঁকে নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। এভাবে চুপ করে থাকাটাও মাঝে মাঝে তাঁর নিজেরই কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। মাসখানেক পরে তিনি আবার বললেন 'বাবা রাজ, প্রতিশ্রুতিটা আমার ঠিক মনে আছে। কিন্তু আরও একবছর সময় আমায় দিতে হবে। সুদে-আসলে তোমার ঋণ শোধ করে দেবো।

ইংরেজির তৃতীয় শ্রেণীতে রাজ যখন পড়ত সেই সময় থেকে ভার্গব মশাই কথা দিয়ে আসছেন। কিন্তু আজ তিনবছরের মধ্যেও তিনি তাঁর পুত্রের ঋণ শোধ করতে পারেননি।

বাড়ি ফেরার পথে এক সাইকেলের দোকানের সামনে মাস্টার-মশায়ের পা দুটির গতি হঠাৎ স্তব্ধ হলো। দুদিক থেকে সবেগে অগ্রসরমান সাইকেলগুলির মধ্যদিয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে, তাদের বেলের ক্রিং ক্রিং শব্দের সমষ্টিগত কোলাহল শুনতে শুনতে তিনি সাইকেলের দোকানটার সামনে এসে পড়েছিলেন। তারপর নিজের গতিকে কিছুটা শ্লথ করে দোকানের ভেতরের দিকে তিনি তাঁর নজর ফেরালেন।

সামনেই একসারি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নতুন সাইকেল। ফ্রেমগুলো তাদের হলুদ রংয়ের কাগজ দিয়ে মোড়া। ভেতরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সব নতুন টায়ার। পেছনের দিককার কাঠের আলমারিগুলিতে বেল, প্যাডেল, চেন প্রভৃতি নজরে পড়ছে। সাইকেল আর তার খণ্ডাংশে দোকানটা কানায় কানায় ভর্তি। টেবিলের পাশে বসে আছে মোটা গোঁফওলা দোকানদার আর তার পাশেই বোর্ডে সাঁটা বিজ্ঞাপনের পোস্টারে সোয়েটারগায়ে একটি ছেলে বেগে সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছে। মুখে তার হাসির দীপ্তি এবং ডান হাতখানি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। সিঁড়ি বেয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকে নতুন সাইকেলগুলোর ওপর একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভার্গব মাস্টার দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলোর কত করে দাম?'

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝাড়ন দিয়ে সাইকেলের গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দোকানদার বলল, 'কোন মেক-এর গাড়ি চাই বলুন?'

কোটের ভেতর দিকটার যে-পকেটটিতে টাকাগুলো আছে সেই বিশেষ স্থানে হাত রেখে ভার্গব মাস্টার বললেন, 'সাধারণ ভালো একখানা গাড়ি কত টাকায় হতে পারে?'

'রবিনহুড্ নিন! এর দাম হলো তুশো দশ! পাম্প, বেল, চেনকভার সব মিলিয়ে আপনি তুশো পঁচিশে পেয়ে যাবেন।'

মাথা নেড়ে মাস্টারমশাই বললেন, 'এতো!'

'তাহলে আপনি হিন্দ নিন। সবচেয়ে সস্তা কিন্তু দেশী। রবিনহুড হচ্ছে খাঁটি জিনিস। হিন্দ থেকে অনেক ভালো। আপনাদের মত লোকের তো ভাল জিনিসই নেওয়া উচিত। রোজ তো কিনছেন না!'

তারপর ময়লা পোশাক-পরা একটি ছেলেকে আদেশ করল সে, 'গাড়িটা বের করে বাবুকে দেখা।'

মাস্টারমশাইয়ের মুখে অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। বিব্রতভাবে তিনি বললেন 'না, না, এখন থাক। গাড়িটা আজই আমি কিনছি না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম, দামটা জিজ্ঞেস করে যাই।'

'তাতে কী হয়েছে ? আজ নেবেন না। কিন্তু দেখতে দোষ কী ? ওরে, গাড়িটা বের কর। বাবুকে দেখা।'

মাস্টারমশায়ের মুখে অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল, 'না মশায়, এখন থাক। গাড়িতো দেখছি। খুবই ভালো। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অন্য এক সময় আসবো। থ্যাঙ্কস্!' বলেই সবেগে তিনি প্রস্থানোদ্যত হতেই দোকানদার তাঁর কাছে এসে বলল, 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়িও আমার এখানে রয়েছে! খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। ছেলেকে নিয়ে অন্য কোন সময় নিশ্চয় আসবেন। কিন্তু গাড়িটা এক নজর দেখেই যান না। দেখতে তো আর পয়সা লাগে না!' বলে হেসে ওঠে লোকটা।

আর তখন বাধ্য হয়েই ভার্গব মাস্টারকে দাঁড়াতে হল। একটু পরেই ছেলেটি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইকেল সামনে এনে হাজির করল।

'বেশি দিন ব্যবহার করা হয়নি। একেবারে নতুন গাড়ি। বেল আছে, চেনকভার আছে, একটি পার্টস্ও বদলাবার কোন প্রয়োজন নেই।' এই কথা বলতে বলতে ছোকরাটি জোরে বেলটা বাজিয়ে এবং পেছনের দিককার চাকাখানি উঁচু করে ধরে প্যাডেলটাকে বারকতক ঘুরিয়ে দিল। চাকাটা বনবন করে ঘুরতে থাকল আর শিকগুলো সব ঝিক্‌মিক্ করে উঠল।

মাস্টারমশাই রায় দিলেন, 'গাড়িতো খুবই ভালো! একটু এগিয়ে এসে সিটের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে দোকানদার বলল, 'নিয়ে যান মশাই, সস্তায় ছেড়ে দেবো। মাত্র ষাট টাকা। ষাট!'

টাকার পরিমাণ মাস্টারমশায়ের পক্ষে তেমন কিছু বেশি নয়। দু পা এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডেলটা ধরে তিনি বললেন, 'আমারও মনে হয়, বেশি দিন ব্যবহার করা হয়নি।'

'মোটেই নয়! একেবারে নতুন গাড়ি। দশ বছর তো আপনি ফেলেছড়ে চড়তে পারবেন। সারা কানপুর খুঁজে বেড়ান, দিব্যি করে বলছি, এতো কম দামে এ-জিনিস আপনি কোথাও পাবেন না!'

মাস্টারমশাই ভাবলেন, ষাট টাকা দিয়ে নিয়েই যাই সাইকেলটা।

মন সম্মতি দিলেও, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। ছোট-খাটো সাইকেলটির দিকে অকারণেই তাকিয়ে রইলেন তিনি। সাইকেলের গোল বেলটায় তাঁর চেহারাটাকে অদ্ভুত ধ্যাবড়া মত দেখাচ্ছিল। মাস্টারমশাই মনে মনেই বললেন, ষাট টাকায় খুবই সস্তা।

মালিক আঁচ করে নিয়েছে। সে বুঝে ফেলেছে যে আর দুএকটা জুৎসই কথা বলতে পারলেই খদ্দের খালি হাতে ফিরবে না।

'এই তো কাল সকালেই গাড়িটা আমার দোকানে এসেছে। খুব বেশি দেরি হলে কাল সকালের মধ্যে কোন না কোন খদ্দের একে কিনে নেবেই। তার কারণ, এত ভাল একটা জিনিস, ষাট টাকায় পাওয়া প্রায় বিনা পয়সায় পাওয়ারই সামিল। আপনিই ভেবে দেখুন না…।'

মাস্টারমশাই ধীরে ধীরে বললেন, 'যাকগে, ভাই, দিয়ে দাও।'

দোকানদার চটপট রসিদ লিখে ফেলল। মাস্টারমশাই টাকা গুণে দিয়ে দিলেন। টাকা রাখতে রাখতে দোকানদার নমস্কার জানাল। ছেলেটি সাইকেলটাকে বাইরে বের করে দিল। কাপড়টাকে বেশ করে সাপটে নিয়ে পা তুলে মাস্টারমশাই ঝপ্ করে সাইকেলের ওপর চড়ে বসলেন। জংলী মহারাজ রোড ধরে খুব জোরে বেল বাজিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছেন মাস্টারমশাই। নিজের বয়স, পেশা, রক্তচাপ প্রভৃতির কথা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। তিনি যেন আর একবার কিশোর হয়ে গেছেন। আগে-পিছে শত শত সাইকেলের সঙ্গে তাঁর সাইকেলটিও ছুটে চলেছে। অগুণতি বেলের মধ্যে তাঁর সাইকেলের বেল নিজের আওয়াজকে দিয়েছে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে। সম্ভাজী পার্ক, মডার্ন হাইস্কুল, অবজারভেটরীর সামনের মোড়, এগ্রিকালচার-কলেজের চৌহদ্দি, রেলওয়ে গেট এবং বোম্বাই-পুনা রোড…।

সাইকেল ঘুরিয়ে মাস্টারমশাই বাংলোর মধ্যে এসে ঢুকলেন। নিজের আউট হাউসের কাছে পৌঁছতেই সাইকেল থেকে নীচে নেমে জোরে বেল বাজিয়ে দিলেন তিনি।

ছুটে বেরিয়ে বাবার হাতে সাইকেল দেখে রাজ অবাক হল।

কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতে মাস্টার-মশাই বললেন, 'এই নাও, তোমার সাইকেল।'

'আপনি কিনে আনলেন?'

হাসিমুখে শুধু 'হ্যাঁ' বলে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর মাথা থেকে টুপি খুলে হাতে নিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন এবং কোটটা না খুলেই ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে টুপি নেড়ে হাওয়া খেলেন তিনি।

ভার্গব-গৃহিণী ঘরে ঢুকতেই গেটের কাছে সাইকেল-চড়া রাজ এবং সিট ধরে তার পেছনে ধাবমান সুধা আর মনুকে তিনি দেখতে পেলেন। বিস্মিত হয়ে মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

ধুতির একপ্রান্ত দিয়ে মাস্টারমশাই তাঁর মুখ মুছছিলেন। মুখে যেন তাঁর আনন্দের এক দীপ্তি। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবেগ প্রবল থাকায় বেশ কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। চেয়ারে গা এলিয়ে দেওয়া অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'রাজের জন্য সাইকেল আজ কিনে আনলাম। বেচারা অনেক দিন থেকে আশায় আশায় রয়েছে।'

হৃষ্ট চিত্তে মাস্টারমশাই পঞ্চম শ্রেণীতে এসে ঢুকলেন। ছেলেদের সোরগোল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। টেবিলের কাছের চেয়ারটিতে বসে ভার্গব মাস্টার উপস্থিতির খতিয়ান নিতে থাকলেন। দ্রুতগতিতে এক একটি ছেলের নাম ডাকছিলেন তিনি। 'কৃষ্ণবর্মা' নামটির কাছে এসে মাস্টারমশাই মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন। একদিনের জন্যও গরহাজির থাকে না এমন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে সে। আজ পরপর চারদিন হলো স্কুলে আসছে না কেন একথা হঠাৎ এখন তাঁর মনে পড়ল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কৃষ্ণবর্মার পাশে বসে ফোলা-ফোলা গালের মনোহর গুপ্ত নামের যে ছেলেটি, গম্ভীরভাবে তাঁরই দিকে চেয়ে আছে। এই ছেলে দুটি বরাবর একই বেঞ্চিতে বসে। কৃষ্ণবর্মার অনুপস্থিতির কারণ ওর হয়তো জানা থাকতে পারে, মনে করে, মাস্টারমশাই তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মনোহর!'

কপালের ওপরকার চুলের গুচ্ছকে পিছনদিকে সরিয়ে দিয়ে ডাগর দুটি চোখ মেলে মনোহর উঠে দাঁড়ায়, 'ইয়েস স্যার।'

'তোমার বন্ধু কি বাইরে কোথাও গেছে?'

মনোহর নির্বাক। মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। কাঠবিড়ালের মত চঞ্চল চপল এই ছেলেটি বোধ হয় তাঁর কথাটা ঠিক মতো শুনতে পায় নি, ভার্গব মাস্টার মনে করলেন। ওর মন হয়তো অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে। তাই তিনি গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কৃষ্ণবর্মা কি বাইরে কোথাও গেছে? পরপর চারদিন হলো স্কুলে আসছে না কেন?'

চোখ তুলে চেয়ে মনোহর বলল, 'না, স্যার। সে বাইরে যায় নি।'

বাধবাধ ভাবে বেরিয়ে আসা তার মুখের এই কথাকটি থেকে ভার্গব মাস্টারের আন্দাজ করে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না যে ব্যাপারটা অন্য ধরনের। স্বাভাবিক স্বরে ছেলেটি তাঁর প্রশ্নের জবাব দেয় নি। তার কণ্ঠস্বরের বিষণ্ণতার আমেজটা সহজেই তাঁর কাছে ধরা পড়ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে মনোহরের বেঞ্চির কাছে চলে গেলেন তিনি। মনোহরের মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো।

'কৃষ্ণ বাইরে কোথাও যায় নি?···তাহলে গত চারদিন কেন সে স্কুলে আসছে না?'

কিছুটা ব্যথিত স্বরে মনোহর বলল, 'স্যার, সে মারা গেছে।'

একমুহূর্তের জন্য মাস্টারমশাইয়ের হৃৎস্পন্দনের গতি যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। রোগা পাতলা ছিপছিপে গড়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত পোশাক পরিধানকারী, মেয়েদের চেয়েও কোমল ক্লাসের সেরা ছেলে কৃষ্ণ মারা গেছে! এই তো চারদিন আগেও সে ওই বেঞ্চিটাতে বসেছিল। নবাঙ্কুরের মত, বৃক্ষ-শিশুর মতো সুলক্ষণ সেই ছেলেটি! সত্যিই কি আর নেই? কী কুশাগ্রবুদ্ধি, কত অভিমানী ছিল সে!

ধরা গলায় মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছিল?'

'স্যার, আজই জানতে পারলাম। দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

'অ্যাঁ ? দুর্ঘটনা ?'

'হ্যাঁ, স্যার। স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে সামনে একটা রিকশা এসে পড়ায় সাইকেলের দুটো ব্রেকই একসঙ্গে কষে দিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সজোরে পড়ে গিয়েছিল। মাথায় চোট লেগেছিল মারাত্মক রকমের। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু···।'

'সাইকেল থেকে পড়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, স্যার। খুব জোরে সাইকেল চালাত, দারুণ বেগে স্যার। দুর্ঘটনার ভয় করতো না, স্যার।'

নতুন-কেনা সাইকেলটার হ্যাণ্ডেলের ওপর খোদাই করা 'কৃষ্ণবর্মা, সদাশিব পেট, পুনা' এই নাম-ঠিকানা হঠাৎ মাস্টারমশাইয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনটাও যেন পর্বতপ্রমাণ এক বোঝার নিচে চাপা পড়ল। বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত পশুর মত তাঁর মন মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে থাকল।

ছেলেরা কানাকানি করতে লাগল। আলোড়নের সৃষ্টি হলো সারা ক্লাসে। আতঙ্কে, ভয়ে ছেলেগুলির মুখ পাংশু হয়ে উঠল। আগুনের হলকায় শ্যামল পত্র পল্লব যেমন ঝলসে যায়, ঠিক সেই রকম।

কোন মতে ক্লাস শেষ করে টিচার্সরুমে এসে চেয়ারের কোলে আশ্রয় নিলেন মাস্টারমশাই। চাপরাসিকে ডেকে বললেন, 'শোন, একটু খাবার জল আনো, আর রাজের ক্লাসে গিয়ে তাকে ডাক।'

জল দিয়ে চাপরাসি চলে গেল। ভিজে ঠোঁটের ওপর জিভটাকে বার কতক বুলিয়ে দিয়ে মাস্টারমশাই মনে করতে চেষ্টা করেন, সাইকেলের পালিশ করা হ্যাণ্ডেলের ওপর লেখা যে নামটা তিনি দোকানে পড়েছিলেন, সেটা কি কৃষ্ণবর্মারই ? না আন্দাজে ধরে নিচ্ছেন ? এতখানি বিষণ্ণ এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন কেন তিনি ? কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুসংবাদই কি এর কারণ ? অথবা সম্ভাবিত কোন বিপদের আশঙ্কায় তিনি এতটা বিচলিত ? মৃন্ময় এ দেহের কি কোন স্থায়িত্ব আছে ? আজ আছে, কাল নেই! যে জন্মেছে, কোন না কোন দিন, মরতেই

হবে তাকে। নিষ্পাপ শিশুটির মৃত্যু কিন্তু বড়ই বেদনাদায়ক। খাকি হাফ্ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিহিত রাজ ইতিমধ্যে এসে পড়ল। হাসিমুখে প্রশ্ন করল, 'আমায় ডেকেছেন, বাবা ?'

নিজের মানসিক উদ্বেগ এবং আকুলতাকে ঢাকার চেষ্টা করে মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, সাইকেলটা তোমার কেমন হয়েছে ?'

'খুব ভালো। উড়োজাহাজের মতো বেগে চলে।'

'আচ্ছা !...কিন্তু ঠিকমত চালাতে পারছ তো তুমি ?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল প্র্যাকটিস আছে আমার।'

'তা আমি জানি, তবু অতো ভিড়ের মধ্যে হ্যাণ্ডেলটা ঠিক মত সামলাতে পারবে তো ?'

'হ্যাঁ, সকলের পাশ কাটিয়ে জোরে বেরিয়ে চলে এসেছি।'

'তবে তো ভালই।...আর হ্যাঁ, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বোধহয় কারো নাম লেখা আছে। নামটা মনে আছে তোমার ?'

'তার ওপর কৃষ্ণবর্মার নাম খোদাই করা আছে। ওটা আগেকার মালিকের নাম। ঘষে ওটাকে আমি তুলে দেবো।'

'আচ্ছা, এইবার তুমি তোমার ক্লাসে চলে যাও।'

বাবার মনে যে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, রাজ তার কি জানে ? মাস্টারমশায়ের মনের বোঝা বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না। সন্ধ্যা হলো। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। অবসন্ন দেহটাকে কোন মতে টেনে মাস্টারমশাই সাইকেলের দোকানে এলেন। সগুম্ফ মালিক দোকানে নেই। ময়লা পোশাক-পরা ছেলেটি পাংচার পরীক্ষা করছে। মাস্টারমশাইকে আসতে দেখে সে বলল, 'আসুন।'

'মালিক কোথায়, ভাই ?'

'বাড়ি গেছেন। এই এলেন বলে। বসুন।'

সাইকেলটা এই দোকানে কে রেখেছে, তার ঠিকানা কি, সে খবর ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করবেন বলে ঠিক করলেন মাস্টারমশাই। পরক্ষণেই আবার ভাবলেন, এ বেচারা কি জানে! বেঞ্চিতে বসে

পড়লেন। পাঁচ সাত মিনিট কেটে গেল। মালিক এলো না।

'পাঁচ মিনিটের ওপর হয়ে গেল, ভাই।'

'এসে যাবেন। বলুন, কি চাই আপনার?'

'যে-সাইকেলটা কাল আমি নিয়ে গেলাম সেটা আগে কার ছিল? তুমি কিছুই জান? এই কথা, জিজ্ঞেস করতাম তাকে।'

'অতো বলতে পারবো না। বসুন। উনি এসে পড়বেন এখুনি।'

উদ্বিগ্নভাবে দশ পনেরো মিনিট মাস্টারমশাই সেই দোকানে বসে রইলেন। শেষে মালিক এসে পৌছল। সে প্রশ্ন করল, 'বলুন, সাইকেলটা আপনার ছেলের পছন্দ হলো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে আর একটু কষ্ট দেবো। সাইকেলটার আগেকার মালিকের নাম বলবেন একবার?'

দোকানদার কি একটু ভেবে নিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি তার কাছ থেকে রসিদ নিয়েছি। দেখে শুনে ভাল লোক বলেই মনে হলো। চোরাই মাল যারা বেচে তাদের চিনতে মোটেই দেরি লাগে না আমাদের।'

'না, না, আমার উদ্দেশ্য তা নয়। আমি কি বলেছি যে গাড়িটা চোরাই মাল? কিন্তু আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে রসিদটা আমি একবার দেখব।'

'না মশাই, আপত্তির কি আছে? অনায়াসে দেখতে পারেন।'

দোকানদার রসিদ দেখাল। 'আনন্দবর্মা, সদাশিব পেট, পুনা—২।'

সে বলল, 'যে লোকটি আমার এখানে সাইকেল বেচেছে, খুব ভাল লোক বলেই মনে হলো তাকে। এত সুন্দর একখানা নতুন গাড়ি এত কম দামে বেচতে দেখে আমারও প্রথমে খটকা লেগেছিল। কিন্তু সে বলল, গাড়িটা তার ছেলের কাজে লাগল না। যে দাম আমি দিতে চাইব তাতেই বেচে দেবে সে। আসল রসিদ দেখে তারপর আমি গাড়িটা কিনেছি! আমার ধারণায়, ঝঞ্ঝাটের কিছুই নেই এর মধ্যে।'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই বললেন 'না, ঝঞ্ঝাটের

কিছু নেই। এমনি-ই দেখার ইচ্ছে হলো আমার। আচ্ছা, নমস্কার।' বাড়ির পথে পা বাড়ালেন তিনি।

ছেলেকে সাইকেল কিনে দেওয়ার আনন্দ উঠে গেছে। আর তার জায়গায় তাঁর মনে এক অসহনীয় অস্বস্তি বাসা বেঁধেছে। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাঁর মনের বোঝাটা হয়ে উঠেছে গুরুতর। সংখ্যাহীন আশঙ্কা তাঁর মস্তিষ্কে তুফানের সৃষ্টি করেছে। অবোধ এই ছেলেগুলো ভীড়ে ভারাক্রান্ত পুনার রাজপথে কী অসতর্কতার সঙ্গেই না গাড়ি চালায়! ওদের কি সে খেয়াল আছে যে যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে মা বাপের কি হবে! মনটা বার বার ঘুরে ফিরে এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনছে যে রাজকে সাইকেল কিনে দিয়ে মস্ত বড় একটা ভুল করেছেন তিনি। মোটর আর গাড়ি-ঘোড়ার ওই ভীড় ঠেলে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরেছে তো রাজ? অসম্ভব। নতুন সাইকেল পেয়েছে এবং আজকে হচ্ছে প্রথম দিন। বই, ব্যাগ প্রভৃতি ক্যারিয়ারে চাপিয়ে পুনার পথে পথে নিশ্চয় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মানুষ জন আর গাড়ি-ঘোড়ায় ভরে গেছে পথ। ভয়ানক ভীড়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে সে সাইকেল হাঁকাচ্ছে নিশ্চয়। সাইকেল পাওয়া গেছে, আবার কী চাই! মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেতনাশূন্য হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে হয়তো সে। এখনো সে যে বাড়ি পৌঁছয়নি তা প্রায় অবধারিত। বন্ধুদের দেখিয়ে দেখিয়ে প্রাণ ভরে সাইকেল চালানোর আশাকে সে আজ অবশ্যই পূর্ণ করে ছাড়বে। আর কে জানে, যদি কৃষ্ণের মতো কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়! একজন মানুষের জীবনকালে এ-ধরনের একাধিক দুর্যোগ ঘটতে দেখা গেছে। যে-আশঙ্কায় তিনি আতঙ্কিত সেটাই না আবার সত্য হয়ে বসে! রাজের সাইকেল কোন মোটরের সঙ্গে ধাক্কা না খায়! ভাবতে ভাবতে মাস্টারমশায়ের মন খুব বেশি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অমঙ্গলের আশঙ্কা তাঁর চোখের পর্দায় একাধিক বীভৎস দৃশ্য এঁকে দেয়। মানুষ করা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে পিতার মন কতখানি বিচলিত হয়, তাঁর মনের অবস্থা কী

রকম দাঁড়ায়, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। মাস্টারমশাই চিন্তা করে দেখলেন, রাজের অবর্তমানে তিনি বড়জোর এক হপ্তা বেঁচে থাকবেন!

বাংলোর চৌহদ্দি পার হয়ে নিজের বাসার কাছে পৌছেই তিনি অনুভব করলেন যে তখনি কোন অপ্রাতিকর ঘটনা সেখানে ঘটেছে। যে দরজা সব সময়ের জন্য খোলা থাকে, তা আজ ভেতর দিক থেকে বন্ধ। দুষ্টুমি আর লাফালাফিতে পাড়া মাতিয়ে রাখে যে সুধা এবং মনু তাদের আজ বাড়ির আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দরজার সামনে নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মাস্টার-মশাই। অনুভব করলেন, পা দুটি কম্পমান, এখুনি বুঝি পড়ে যাবেন। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে দরজায় কান পেতে ভেতরের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলেন তিনি।

সূর্যদেব অস্ত হয়েছেন। অন্ধকার এসে চারদিক থেকে ধরিত্রীকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বায়ু নিশ্চল এবং কাছের কোথাও থেকে ভেসে আসছে কাকের কর্কশ কা-কা রব। বাড়ির ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। বিছানার পাশে সুধা আর মনু বসে। বই-এর আড়ালে লুকানো তাদের মুখ দুটি চকিতের জন্য একবার ওপরে তুলে বাবাকে দেখেই আবার লুকিয়ে ফেলে ওরা। ওদের কাঁদো কাঁদো মুখের ভাব মাস্টারমশায়ের চোখ এড়ালো না।

রাজের মা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ছিলেন। স্বামীকে দেখেই তিনিও উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

টুপিটা মাথা থেকে হঠাৎ খুলে মাস্টারমশাই ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলেন। নিজের হৃদস্পন্দনকে তিনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। ঘরটার নিদারুণ নীরবতা এক সময় তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'অন্ধকার হয়েছে, আলো জ্বালাও।'

চুপিচুপি উঠে সুধা সুইচটা টিপে দিয়ে আবার বসে পড়ল। রাজের মা রান্নাঘরে কি যেন কাজে ব্যস্ত।

দ্বিতীয় বার মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন 'রাজ ফেরেনি ?'

মন্নু জবাব দিল, 'না।'

'আসেনি ? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখনো বাড়ি ফেরেনি ছেলেটা ? আজ তোমরা সব চুপচাপ মনমরা হয়ে এভাবে বসে রয়েছো কেন ? কি হয়েছে তোমাদের ?' কোন্ মারাত্মক সংবাদ তাঁকে এইবার শুনতে হবে তা মাস্টারমশাই বুঝে উঠতে পারলেন না। সংবাদেবর ভয়াবহতার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে। দ্রুততালে বুকটা স্পন্দিত হচ্ছে তাঁর। মনটা ক্রমাগত মুষড়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ কোন জবাব না পেয়ে, অতিকষ্টে কম্পিত কণ্ঠে, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এরকম চুপচাপ আছ কেন ? তোমাদের কি বাকরোধ হয়েছে ? আরে বাবা, যা হয় একটা কিছু বলবে তো, আসলে ব্যাপারটা কি ?' সুধা আর মন্নু একবার পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর দরজার দিকে চেয়ে রইল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধাজড়িত স্বরে রাজের মা বলল, 'নতুন সাইকেলটা রাজ কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে।'

মাস্টারমশায়ের বুকের ওপরের ভয়ানক সেই বোঝা কে যেন হঠাৎ একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। অদ্ভুত এক খুশীতে ভরা ঝরঝরে ভাব অনুভব করলেন তিনি। স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে নিজেই মৃত দেখে চমকে জেগে ওঠার পর নিজেকে জীবিত দেখে মানুষ যে ধরনের আনন্দ অনুভব করে তাঁরও অনুভূতিটা এই মুহূর্তে ঠিক সেই রকমের ছিল। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণে তাঁর ম্লান মুখখানি খুশীর আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এতক্ষণ ভাঙা চেয়ারে শুয়ে ছিলেন, এবার তিনি উঠে বসে প্রসন্ন স্বরে বললেন, 'সাইকেল হারিয়ে গেছে ? যাকগে, তাতে কী হয়েছে ? এরই জন্যে তোমরা এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে ছিলে ?'

রাজের মা অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে

চেয়ে রইলেন। বাবা একটু রাগলেন না দেখে বাচ্চারাও যারপর নাই বিস্মিত হলো।

বহু জায়গায় খোঁজাখুজির পর থানায় রিপোর্ট করে রাজ শুকনো মুখে বাড়ি ফিরল। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে, খুনের কেসের আসামীর মতো জড়োসড়ো হয়ে সে গিয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলে বাপের দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তার হলো না।

তাকে দেখেই প্রসন্নস্বরে ভার্গবমশাই বললেন, 'তোমার সাইকেল গেছে, রাজ?...যাকগে, তাতে কী হয়েছে? দুঃখ কোরো না। আমি তোমায় আর একটা সাইকেল কিনে দেবোখন।...'

বাপের মুখ থেকে এই কথা শুনে রাজ হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাপের কাছে এটা অপরাধ বা লোকসান বলে মনে হয়নি।

ভার্গবমশাই কাছে এসে, তাকে বুকে টেনে নিয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, 'আরে, কাঁদার কী আছে রে, পাগল! মোটে যাট টাকার তো ব্যাপার। পরের মাসে মাইনে পাওয়া মাত্র আমি আবার কিনে দেবো।'

কিন্তু রাজ সবই জানত। তার ফোঁপানি অনেকক্ষণ থামেনি।

আঘাত

বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর

ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে অথচ উঠতে ইচ্ছে করছে না। তন্দ্রায়-আবেশে শুয়ে আছি। ঘুম আর জাগরণের এই মাঝামাঝি অবস্থাটা চমৎকার লাগে। কৈশোর উত্তীর্ণ কুমারীর মত মন মেলে ধরে অসংখ্য শতদল। পা এই মর্ত্যভূমির উপর থাকলেও হাত যেন স্বর্গ পেতে চায়। আধা-ঘুমজাগরণের সময় আমার এই ধরনের অনুভূতিই জাগে।

সেদিনও তাই হয়েছিল। আমি দোল খাচ্ছিলাম বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু ঘুমের আমেজ কাটেনি! ঘুমের ভ্রমর যেন আমার শরীর-ফুলকে ঘিরে গুন্‌গুন্‌ করছে।

ঠিক সেই সময় বউ ডাক দিল। শুনতে পেলাম তার বেলোয়ারি চুড়ির রিনিঝিনি। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মেজাজে ছেদ পড়ল। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সে বলল, 'কই ওঠ।'

'এত তাড়াতাড়ি?' আমি পাশ ফিরে এমন ভাবে কথাটা বললাম যেন মধ্যরাত্রি সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন সুন্দর ঘুম নষ্ট করে! মনে মনে বিরক্তিও জাগল। কানে-কানে কিছু বলার জন্য সে ঝুঁকে পড়ল। আমার ভিতরকার উদ্দাম প্রেমিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বউকে টেনে ধরে বললাম, 'সক্কালবেলা কী বিড়বিড় করছ!'

'তোমাদের এই দোষ, সময় নেই অসময় নেই, সুযোগ পেলেই আর কথা নেই। ছাড়ো…'

আমি তখনও বউকে জড়িয়ে ধরে একটা মনোরম উত্তাপ পাচ্ছি। শীতের রোদ যেন! বললাম, 'পুরুষ কেবল বর্তমান কালকেই বোঝে। শুধু বর্তমান নয়, একেবারে চলমান বর্তমান!'

আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে সে বলল,

'ওঠ না, কখন থেকে কাকীমা বসে আছে।'

'কাকীমা? মানে, পাড়ার কাকীমা? কী ব্যাপার? হঠাৎ কাকীমা কেন?'

'তোমার সঙ্গে নাকি তার কি কথা আছে।'

কাকীমার আমার সঙ্গে কথা আছে। ভেবে চিন্তেও কারণটা ঠাওর করতে পারলাম না। চোখের সামনে ভাসল তার উদাস-বিনম্র চেহারা। সারা দিনের রোদে পোড়া ফুল যেন।

আমার সঙ্গে তার কোনদিন কোন কথা হয়নি তেমন। পূজো-পার্বণের দিনে কাকীমা বউকে সাহায্য করতে, রান্নাবাড়া করত। কিন্তু আজ আমার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে তার! ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

কাকীমার কথা চিন্তা করার সময় চোখের সামনে ভেসে উঠল তার ছেলের কদাকার-ভোঁতা চেহারা। কালেভদ্রে কাকীমা আমাদের বাড়িতে কোন কাজে সাহায্য করতে এলেই ছেলেটাও সুড়-সুড় করে চলে আসত। তার নিচের ঠোঁট যেন ফাটা। ঠোঁটের দুই প্রান্ত সব সময় সাদা থাকে। মাঝে মাঝে সেই অংশটা চিরে গিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত দেখা দেয়। গোটা মুখে ব্রণের দাগ। মুখটা দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র কে সাঁল কুটে গেছে। সব সময় সে মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকত। গোটা মুখের ঐ কালো পটভূমিকায় দেখার মত ছিল তার চোখ। অন্ধকার পাতকুয়োর জলে হীরের টুকরোর মত তার চোখগুলো জ্বলত।

কাকীমা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। মাত্র একটি ছেলে। কাকীমার মত মা পাওয়া ভাগ্যের কথা! যেদিন ছেলেটা বাড়িতে ফিরত না সেদিন কাকীমাও খেত না। বউকে বলত, 'গোবিন্দ না খেলে আমার মুখে কিছু রোচে না।' ছেলের প্রসঙ্গ তুললেই কাকীমা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো।

সেই কাকীমা নিচে অনেকক্ষণ বসে আছে আর আমি বিছানায় শুয়ে আছি। আর এক মুহূর্ত দেরি নয় উঠে পড়ি।

নিচে নেমে দেখি কাকীমা হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। আমি তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'কী হল, কী হল কাকীমা ?'

বউ ততক্ষণে এসে বলল, 'গোবিন্দকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।'

সেই কদাকার-ভোঁতা লোকটা এমন কোন্ বিপ্লবী মহাপুরুষ যে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে!' মন বলল, বলা যায় না গোবরেও তো পদ্মফুল ফোটে।

চোখ মুছতে মুছতে কাকীমা বলল, 'উকীলবাবু, ছেলে আমার সেরকম নয়। ছেলেবেলা থেকে কোনদিন সে কারো এক ইঞ্চি সূতোও না বলে নেয়নি। কি জানি আজ সে…'

বুঝলাম গোবিন্দকে চুরির অপরাধে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু চুরি করল কার বাড়িতে! কি চুরি করেছে সে—কার জিনিস চুরি করেছে সে! কাকীমা হাতজোড় করে বলল, 'অনেক বড় বড় খুনী-ডাকাতকে বাঁচিয়েছেন; যে কোন ভাবে আমার গোবিন্দকে বাঁচাতেই হবে—সারাজীবন আপনার কাছে…'

বিছানায় যখন শুয়েছিলাম তখন আমার মধ্যে একজন কবি, পৃথিবীর মনোরম মাধুর্য্য সম্ভোগে ব্যস্ত ছিল কিন্তু এখন আমি উকীল। আমার ভেতরের উকীল সেই কবিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। আমি ধীর শান্ত গলায় বললাম, 'কে বলল গোবিন্দ চুরি করেছে? কে এই ধরনের কেস করেছে ?'

'জমিদার বাবু! গোবিন্দ তো আজকাল ওদের বাড়িই কাজ করে।'

'কাপড়ের দোকানে গোবিন্দ কাজ করত না ?'

কাঁপা গলায় কাকীমা বলল, 'সেখানে তো অনেক দিন আগেই তার ছাঁটাই হয়ে গেছে। তারপর আরও কোথায় কোথায় যেন চাকরি করেছে। কিন্তু ওখানেও কাজ বেশি দিন রইল না। শেষে কদিন হল জমিদারবাবুর বাড়িতেই কাজ করছে।'

গোবিন্দর উপর আমার খুব রাগ ধরল। এভাবে ঘন ঘন এখানে ওখানে চাকরি ধরে ছেড়ে মাকে এত দুঃখ দিচ্ছে। এখন তো সে বাচ্চা ছেলেটি নয়। জোয়ান হয়েছে। কত পুন্যি না করলে লোকে এমন মা পায়। আর সেই মাকে সে কিনা এমন ভাবে কাঁদাচ্ছে!

আমি কাকীমার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নিচু করে নিল। আজ পর্যন্ত সে শুধু গরিব ছিল, তার জন্য তার কোন লজ্জা ছিল না। কিন্তু আজ থেকে সে যেন অনুভব করছে সে একটি চোরের মা। মানুষ পেটে একটা আঘাত সহ্য করতে পারে কিন্তু মনে আঘাত পেলে···

মায়ের জ্বালা

বসুন্ধরা পটবর্ধন

আত্যাবাই ভোরে উঠে বারো-ঘর-এক-উঠোনের বাড়ির সার্বজনীন কলে মুখ ধুয়ে নেয়। তার ঘরের কাছে নর্দমা নেই। কাজেই তাকে কলের কাছে যেতে হয়। কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে আবার কয়েক আঁজলা জলে কল ধুয়ে নেয়। তারপর পা ধোয়। পা রগড়ে রগড়ে ধুয়ে পায়ের পাতা পরিষ্কার করতে করতে বিড় বিড় করে, 'পা ফাটতে দেব না।'

প্রতিবেশিনী কলসি কাঁখে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির অন্য মহিলারা হেসে ওঠে। এক বাচাল মেয়ে বলে, 'কি আত্যাবাই কতক্ষণ চলবে? তোমার পায়ে কি লেগেছে বলতো?'

এক শান্তি প্রিয় বৃদ্ধা বলে, 'তোমার কাজ তুমি কর আত্যাবাই। ওদের কথায় কান দিও না।'

আত্যাবাই আঁজলা আঁজলা জল পায়ে ঢালতে ঢালতে বলে, 'সে আমাকে কি ভাবছে কে জানে? আমি তো পূর্ব জন্মের সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলছি। সেইজন্যই তো আমার বেশি জলের দরকার।'

আত্যাবাই শেষ আঁজলা জল নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যায়। পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে সে উঠোন থেকে ঘরে ঢোকে। ঘরের দরজা খোলে। কলের কাছে যাওয়ার জন্যও সে দরজা তালাবন্ধ করে যায়। ঘরের ভেতরে ঢুকে ষ্টোভ ধরায়। দু কাপ চায়ের জল বসায়। কিছুক্ষণের মধ্যে দু কাপ চা বানিয়ে কার প্রতীক্ষায় যেন পথ চেয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে। মাঝে শুধু একবার উঠে জানলার কাছে যায়। জানলা দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে, 'এত দেরি করছিস কেন? অভ্যেসটা এখনও গেল না।'

অনেকক্ষণ দেখার পর সে নিজের কাপের চা খেয়ে নেয়। অন্য কাপ

প্লেট চাপা দিয়ে মনে মনে বলে, 'তোকে এই চা-ই খেতে হবে। আর আমি গরম করে দেব না।'

চা-এর কাপ ধুয়ে রেখে দেয়, তারপর বাসন রাখার এক পুরনো বাক্সের উপর বসে পড়ে। অনেক দিন ধরে বসার ফলে বাক্সের উপরটা মসৃন হয়ে গেছে। এক পা নিচে ঝুলিয়ে অন্য পা তুলে গুটিয়ে নেয়। গোটানো পায়ের আঙ্গুল চুলকোতে থাকে। চুলকোতে চুলকোতে দু হাতের আঙ্গুলগুলোয় ব্যাথা ধরে যায়। একবার ডান হাতের আঙ্গুল অন্যবার বাঁ হাতের আঙ্গুল চুলকায়। এসব করতে করতে সে কি ভাবছিল জানি না। তার চঞ্চল চোখ ঘরে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার অস্থির চোখ যেন কোন এক রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কোন কিছুরই কিনারা যেন করে উঠতে পারে না। তারপর উঠে দাঁড়ায়। জানলার কাছে গিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকায়, তারপর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। দরজা দিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। পোস্টঅফিসের পিয়ন আসার সময় হয়েছে। দরজায় হাত রেখে, বিচিত্র ঢং-এ দাঁড়িয়ে থাকে। তক্ষুনি পিয়নের পরিচিত পায়ের শব্দ শুনতে পায়। আশপাশের বাড়িতে সে চিঠি দেয়। তারপর সামনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে। সেখানে সে কটি চিঠি বিলি করেছে কে জানে। আত্যাবাই দারুণ ভাবে অস্বস্তি বোধ করছে। এখনও পিয়নটা তার কাছে আসছে না কেন? সে দোর গোড়ায় আসবে এই কল্পনায় তার মন ভরে যায়। তখনি তাকে দেখতে পায়, যোশীকে চিঠি দিয়ে বেরিয়ে সে সোজা বাড়ির বড় দরজার দিকে এগিয়ে যেত। আত্যাবাই ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই যে আমার চিঠি এসেছে?'

পিয়ন প্রত্যেকদিন আত্যাবাইয়ের কাছে এই প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত। সে 'না' বলে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্যাবাই তার কাছে ছুটে গিয়ে বলে, 'মিথ্যা কথা। আমার কোন চিঠিই তুমি দিতে চাও না।'

'তোমার কোন চিঠিই আসেনি আত্যাবাই।' পিয়ন বলে।

'আসেনি বললেই হল। আমাকে চিঠি দেওয়ার ইচ্ছে নেই? সারা গাঁয়ের লোককে চিঠি দাও আমাকে দিতে পার না।'

'কার চিঠি আসবে তোমার কাছে?' পিয়নের কৌতূহলী প্রশ্ন।

'জগ্‌গুর। আজকেই তার আসার কথা ছিল। কালকেই তার কাছে চিঠি দিয়েছি। আরও দু একদিন দেখি।'

'হ্যাঁ তাই দেখ। কালকে আসলে ঠিক তোমায় দিয়ে যাব।' বলে পিয়নটা যেন পালিয়ে বাঁচে।

আত্যাবাই ঘরে ফিরে আসে। শাড়িটাকে ঠিকভাবে পরে নিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে তিন তিনবার তালা টেনে দেখে। গলায় ঝোলানো চাবির গুচ্ছ বের করে তা দেখে নিয়ে আবার ঝুলিয়ে নেয়। তারপর জোরে পা চালায়। বড় দরজার কাছে এসে হঠাৎ থেমে যায়, সেখানে তিনটি শ্বেতপাথর পড়ে থাকে। তাদের উপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকায়। তারপর নেমে গিয়ে হাঁটে।

আত্যাবাইয়ের হাত পা চীনা মহিলাদের মত ছোট ছোট। শরীরের গড়নও মাঝারি। এক ফুট চওড়া আর চারফুট ন ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু চেহারাটা খুব ফর্সা, নাক উঁচু। আর চোখ বেড়ালের চোখের মত ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। মাথাটি গাঁদা ফুলের মত গোল। কয়েকগাছা চুলে পাক ধরলেও আত্যাবাই এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সেও তলোয়ারের মত সতেজ। তার ডান হাত সব সময় এগিয়ে থাকে। কোন সময় হাত পেছনে থাকে না। আর শাড়িটা মাটিতে গড়ানোর ফলে মাঝে মাঝে পায়ে ফেঁসে যায়। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। আত্যাবাই পথের মোড়ে এসে পৌঁছায়। কিছুক্ষণ থেমে ভাবে, কিছু ঠিক না করে ফিরে যায়। বার বার তার শাড়ি ফেঁসে যায়। সে যত দ্রুত যায় তত দ্রুত ফিরে আসে।

বড় দরজার কাছে এসে, ঐ দুই শ্বেত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নিজের গলার চাবি বের করে দেখে নিয়ে ঘরের তালা খোলে।

তালা খুলেই আবার বন্ধ করে দেয়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আঙ্গুল দিয়ে বাতাসে দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা এঁকে তালা খুলে ঢোকে।

তারপর শাক কুটতে শুরু করে। মন বসিয়ে শাক কোটে। সে যদি হঠাৎ খাওয়ার সময় আসে—তাই সে একজনের খাওয়ার বেশি রাঁধে। চাট্‌নি, তুটো তরকারি, ডাল, ভাত ও রুটি। কি যেন নিজে নিজেই বিড়বিড় করে। পরে হাত ধুয়ে নেয়। জল আর পিঁড়ি রাখে। ঘরের কোণে থাক। ঠাকুর দেবতার সামনে প্রদীপ ধরায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে। ফিরে এসে বাক্সের উপর বসে।

এক পা সে ঝুলিয়ে বসে। তারপর পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খুঁজতে শুরু করে। কড়া রোদে উড়তে থাকা মাছির মত তার মাথা চক্কর দেয়। সে জগ্‌গুর পথ চেয়ে বসে থাকে। যতক্ষণ না ক্ষুধার জ্বালায় তার পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো দলা পাকিয়ে ওঠে। সে পথ চেয়ে বসে থাকে। তারপর অনেক ব্যথা নিয়ে উঠে তু চার গাল খেয়ে খাওয়ার পর্ব সারে। খাওয়ার পর প্রতিবেশিনী তাঈয়ের কাছে যায়। ঘুমে তার চোখ বুজে আসছে। দোরগোড়ায় মাতুর বিছিয়ে যে দিক দিয়ে হাওয়া আসছে সে দিকে মাথা রেখে শুয়ে ছিল তাঈ। আত্যাবাই তাকে নেড়ে, জাগিয়ে বলে, 'তাঈ, জগ্‌গু আসলে আমাকে তুলে দিও। কিছুক্ষণ ঘুমোতে যাচ্ছি।'

তাঈ বলে, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক ডেকে দিও কিন্তু। না হলে ছেলেটা এসে মাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে অভিমান করে হয়ত ফিরে যাবে'।

'ঠিক আছে তুলে দেবখন, একটু আরামে ঘুমিয়ে পড়, আর কত চিন্তা করবে।'

'না না সে যদি চট করে চলে আসে তাই…।'

'সে আর আসবে কোত্থেকে!'

'আসবে না কেন? তুমিই কি চাও সে না আসুক?'

'আমি চাইব কোন্ তুঃখে!' প্রতিবেশিনী বলল।

'তাহলে তুমি ও কথা বললে কেন?' আত্যাবাই ভারি গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বিশু আসে, কাকার চিন্তা আসে, ননদের মনোহর আসে, আর আমার জগ্‌গু আসবে না?'

'হ্যাঁ আসা তো উচিত।'

'শুধু আসা নয়, অবশ্যই আসা উচিত।'

'তা ঠিক।' বেসামাল হয়ে প্রতিবেশিনী তাঈ বলে।

'ঠিক নয়তো কি। তোর ছেলে চা খায়, ভাত খায়, রুটি খায়, বাইরে যায়, ফিরে আসে। আর আমার ছেলে এমন কি দোষ করেছে যে, যাবে আর ফিরে আসবে না?'

'আত্যাবাই। সে ফিরে এলে আমিও আনন্দ পাব।'

'আনন্দ মানে, সারা ঘর ভরে যাবে আনন্দে। আর জগ্‌গু তোমার বিশুর মত সারাদিন বক বক করবে। রাজ্যের গল্প বলে বিরক্ত করবে। বাইরে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। ভাল কথা, শুনছি তোমার বিশুর জন্য বউ ঠিক করেছ?'

'ঠিক শুনেছ। তুমি ঘুমো। ঠিক সময় তুলে দেবখন।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু দেখ, আমার জগ্‌গুর জন্য ভালো একটা মেয়ে দেখে রাখ। মেয়েটি যেন দেখতে শুনতে ভালো হয়। ছেলে আমার পুলিশে কাজ করে বলে কালো কুচ্ছিত মেয়ে হলে চলবে না কিন্তু! সে তুমি যতই বলনা কেন আমি ভাই কুচ্ছিত বউকে ঘরে আনতে পারবো না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়।' তাঈ বোঝানোর চেষ্টা করলে সে বিড় বিড় করে নিজের ঘরের দোরগোড়ায় মাদুর বিছিয়ে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঠিক সেই সময় দরজার সামনে দিয়ে কে যেন চলে যাচ্ছিল।

'কে? কে যায়?' আত্যাবাই মনে করে তার ছেলে আসছে। আবার ডাকে, 'জগ্‌গু নাকি?' কিন্তু তার ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি, আত্যাবাঈ ভাবতে শুরু করে, আজকেতো মনিঅর্ডার আসার কথা

ছিল। কালকে তো কাকার ছেলের মনিঅর্ডার কলকাতা থেকে এসেছে। তারপর সে উঠে বসে। তারপর ঘুমন্ত তাঈকে জাগিয়ে তুলে বলে, 'তাঈ' ?

'আচ্ছা তুমি কি, বলতো ? ঘুমোচ্ছ না, ঘুমোতে দিচ্ছ না।'

'তুমি ঘুমো না, কে বারন করছে ? আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, 'কাকাদের মনিঅর্ডার এসেছে কি না।'

'হয়তো এসেছে।' তাঈ বলল।

'বলতে না চাও বল না। আমি তো আর ভাগ বসাতে যাবো না। কিন্তু আমি যে দেখেছি তার নামে মনিঅর্ডার আসতে, পিয়ন নিজে নোটগুলো গুনে গুনে দিল। সে দিক দিয়ে বিচার করলে আমার জগ্‌গুরও টাকা আজই আসার কথা।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আসবেখন।'

'আচ্ছা, তাহলে আমি ডাকঘরে যাই ?'

'পিওন তো আসবে। এত রোদে ডাকঘরে যাচ্ছো কেন ?'

'না গিয়ে আর কি করি বল, ডাকঘর যে আমাকে একঘরে করে রেখেছে। আমাকে চিঠিই দেয় না। আর আনবেই বা কেন ? আমার চিঠি এলে তার কি লাভ। সব বদমাইসী। আমার মনিঅর্ডার কেউ দেয়না। সারা গাঁয়ের লোককে টাকা পয়সা বিলোয়, কিন্তু আমার জগ্‌গুর পাঠানো টাকা আমাকে দেয় না।'

'আত্যাবাই, পাগল হয়ে গেছ নাকি ? দেবে না কেন ?'

'হ্যাঁ পাগল তো দুনিয়ার সবাই বলছে। তা বলবে না কেন। আমি যে তাদের পাকা ধানে মই দিয়েছি। কি করি, আমি এ পথে যাব আর সে অন্য পথে এসে খুঁজে আমাকে না পেয়ে চলে যাবে।'

তাঈ কথাটি শুনে তার দিকে পিঠ ফিরে শোয়। তারপর আত্যাবাই নিজের ঘরে এসে মাদুরটা তুলে এককোণে রেখে শাড়ি ঠিক করে নেয়। তারপর দরজায় তালা বন্ধ করে বার দশেক তালাটি টেনে দেখে নিয়ে বড় গেটের কাছে ঐ শ্বেত পাথর দুটোর উপর

দাঁড়িয়ে অনেকদূর তাকায়। অদূরে দাঁড়ানো অন্য ঘরের এক নতুন বউ তাকে দেখে হাসে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'মনিঅর্ডার কখন দেয় ? কে দেয় ?'

লোকটা কোন এক জানলার দিকে তর্জনী দেখিয়ে দেয়। আত্যাবাই সে দিকে ছুটে যায়। 'এই যে এদিকে একটু শুনুন না।' কিন্তু সেখানে তার কথা শোনার মত অবকাশ কারও নেই। আত্যাবাই আরও এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমার মনিঅর্ডার এসেছে নাকি ?'

'আমার, মানে কার ? নাম কি ?'

'আমার মানে, আমার, আত্যাবায়ের।'

'ও তাই নাকি ? তা এখানে মনিঅর্ডার দেওয়া হয় না। ঐ জানালার কাছে যান।'

আত্যাবাই সেখানে ছুটে যায়, তারপর আর একটাতে। কিন্তু সে মনিঅর্ডার পায়নি। ডাকঘরের বাইরে এসে সিঁড়ির উপর বসে পড়ে। তার মনিঅর্ডার আসেনি একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। যে পিওন ঐ দিক দিয়ে যায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'আমার মনিঅর্ডার এসেছে ?'

এই কথা শুনে একজন পিওন, 'না' বলে দিয়ে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত একজন পিওন বলে, 'আত্যাবাই মনিঅর্ডার আসার সময় চলে গেছে। এখন ঘরে যান।'

'সময় চলে যাক, আমি এখানেই বসে থাকব।'

আত্যাবাই ডাকঘরের সিঁড়ির উপরে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকে। তারপর খুব হতাশ হয়ে নিরাশ মনে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নেয়। তার উজ্জ্বল রহস্যময় চোখ সারা পথে কি যেন খুঁজে খুঁজে যায়। পা আর টানতে পারছে না। ক্লান্ত দেহে আত্যাবাই ঘরে ফেরে। ঐ বাসন রাখার বাক্সের ওপর বসে পড়ে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না কি করা যায়। তারপর পায়ের আঙুলগুলো চুলকোতে আরম্ভ করে।

'জগ্‌গু সময় মত কেন আসে না। আর কত দিন ধরে আমি তার

পথ চেয়ে বসে থাকব। কতবার জানালা দরজার কাছে গিয়ে খুঁজেব তাকে। কতবার পথ হাঁটব। ডাকঘরে যাব।' সে এই সব সাত পাঁচ বিড় বিড় করে। গালে হাত দিয়ে বলে, 'হ্যাঁরে হতভাগা মাকে কি তোর মনে পড়ে না? মায়ের প্রতি কি তোর একটুও দরদ নেই? কাকাদের চিন্তা আর তাঈয়ের বিশুর দিকে দেখ। আমি পথ চেয়ে বসে থাকি, চা বানাই, প্রত্যেকদিন তোর জন্য বেশী করে চাল নি তবু তুই আসিস না। অন্তত একটা চিঠি-তো দিতে পারিস। কতদিন হয়ে গেল, মনিঅর্ডার তো পাঠালি না। তুই না দিলে মাকে আর দেওয়ার কে আছে বল। তুই কি আর চিঠি লিখবি না ঠিক করেছিস। ওরে জগ্‌গু আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি, অমন ভাবে চুপ করে আছিস কেন? এখন তোর বিয়ের বয়স হয়েছে। তোকে তো বিয়ে দিতে হবে। আর আমারও কি কম কাজ। নাতি নাতনীদের জন্য কাঁথা সেলাই করতে হবে। কিন্তু তার আগে জগ্‌গু তুই আয়, হাত পা ধুয়ে খেতে বস, বিদেশ বিভুঁয়ে এভাবে পড়ে থাকিসনি'।

তাঈ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। আত্যাবাইকে সে বলে, 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'জগ্‌গুর সঙ্গে।'

''জগ্‌গুর সঙ্গে? কোথায় সে?'

'এইমাত্র এসেছিল। ধারে কাছেই তো ছিল। তোমার আওয়াজ পেয়ে হয়ত চলে গেছে। তোমরা তো আমার ভাল দেখতে পার না।'

'আত্যাবাই একটু সরবৎ বানিয়ে দেব?'

'তাঈ, যাও এখান থেকে। তোমাকে ভালো জানতাম, এখন দেখছি ভুল হয়েছে আমার। তুমিও আমার জগ্‌গুর মঙ্গল চাও না। কিন্তু এতে তোমার কি লাভ হবে বলতো?'

নিস্তেজ হয়ে আত্যাবাই কোমরে হাত দিয়ে কোথাও যাওয়ার উপক্রম করে। তাঈকে চলে যেতে বলে। আত্যাবাই জানালার

কাছে, দরজার কাছে, শেষে পথের উপর দাঁড়িয়ে বজ্রকে বধির করে যেন ডাক দেয় 'জগ্‌গু! জগ্‌গু!'

সে আওয়াজ দূরের দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানে ফিরে আসে। সারা পথের হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সে আওয়াজ। কিন্তু জগ্‌গু সাড়া দেয়না।

জগ্‌গুর জন্য ছুঁড়ে দেওয়া আওয়াজ একাই ফিরে আসে। দুচার মুহূর্ত পাথরের মত একাই দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রেক খাওয়া গাড়ির মত হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সে মেঝের উপর বসে পড়ে। জগ্‌গুর বাক্স সামনে দেখতে পায়। সে সেদিকে এগিয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ে গলায় ঝুলান চাবি দিয়ে সে বাক্স খুলে ওর পোশাক বের করে। জগ্‌গুর পোশাক। ধুতি, প্যান্ট, জামা ইত্যাদি। ঐ পোশাকের দিকে সে প্রখর দৃষ্টিতে তাকায়, তার উপর হাত বুলিয়ে হঠাৎ সে বুকে জড়িয়ে ধরে। বাক্সের পোশাক বের করে সব একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথা নুইয়ে থাকে! তার পিঠ থরথর করে কাঁপতে থাকে। বোঝা যায় সে গুমরে গুমরে কাঁদছে।

তারপর আবার সে সেই বাক্সের উপর বসে পড়ে পায়ের আঙুলগুলো নাড়া চাড়া করতে থাকে। আঙুলগুলো এত জোর চুলকোয় যে বিন্দু বিন্দু রক্ত গড়াতে থাকে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তার চঞ্চল চোখ কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে যেন কোন এক জিনিস চারদিকে খুঁজছে। দেখতে দেখতে আত্যাবাই উঠে বসে। আলমারিতে রাখা কাগজ বের করে। আলমারি থেকে পেন্সিল বের করে। মেঝেতে বসে হ্যারিকেন কাছে টেনে নিয়ে অনেক বছর আগে হারানো নিজের স্বামীকে চিঠি লিখতে শুরু করে। 'শুনছো, আজকাল আমাদের জগ্‌গুও আমার কথায় কান দেয় না। আসে না, চিঠি দেয় না। টাকা পয়সাও পাঠায় না আর…'

অনেকক্ষণ ধরে আত্যাবাই মাথা নিচু করে লিখতে থাকে।

এ চিঠি সে কাল ভোরেই ডাকঘরে ফেলে আসবে। এ চিঠি লেখার পর সব সময়ের মত নিজের জগ্‌গুর নামেও চিঠি লেখে। সে চিঠিও একসঙ্গে চিঠির বাক্সে ফেলে আসবে। এখনও তার ধারণা তার ছেলে জগ্‌গু পুলিশে চাকরি করছে। এক কালো রাত্রির অন্ধকারে জগ্‌গু যে খুন হয়ে গেছে তা যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। যেদিন প্রথম শোনে সেদিনও যেমন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছে আজও তা আঁকড়ে আছে। এক চুলও সে সরে আসেনি। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই সে স্বামীর নামে চিঠি লেখার পর জগ্‌গুর নামে চিঠি লিখতে বসে। 'বাবা জগ্‌গু। অনেকদিন তোর মুখ দেখিনি, আমার আশীর্বাদ নে…

সীতা

কসুমাগ্রজ

স্টুডিওতে গিয়ে দেখি উমাকান্ত তার নিজের ছোট কামরায় আরাম কেদারায় বসে আছে। তার ঠোঁটে একটি নিভে যাওয়া সিগারেট। হাতে একটি দৈনিক পত্রিকা। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি যে সে অন্যমনস্ক। পত্রিকার উপর উমাকান্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও পত্রিকার বড় বড় ব্যানারের কথাও তার মগজে ঢুকছিল কিনা আমার সন্দেহ। আমি ঘরে ঢুকে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকাসত্ত্বেও তার অচঞ্চল মূর্তি দেখে মনে হল না যে তার সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে।

'কী ভাবছ?' কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'ভাবছি—অ্যাঁ!' হঠাৎ চমকে ওঠে।

'এর পর তুমি বললেও বিশ্বাস করব না।'

'দু কলম লিখতে পার বলেই কি লোকের মনও বুঝতে পার?'

'না, অত গভীরে যেতে হবে না। তোমার মুখের সিগারেট আর হাতের পত্রিকা দেখেই অনুমান করা খুব সহজ। পত্রিকাটি যে কবেকার তাও হয়ত জান না।'

'সত্যিই তো! কবেকার এটা?' সিগারেটটি এ্যাশ-ট্রেতে রেখে তারিখ দেখে।

'মাস চারেক আগের হবে না?' কোচে বসতে বসতে বললাম।

'তা...' উমাকান্ত অন্যমনস্কভাবে বলে।

'এখন তাহলে বল কি ভাবছিলে?'

'এমন কিছু না। তবে হ্যাঁ, একটা বিস্ময়ে আজ চিন্তিত।'

সদাহাস্য ব্যক্তিটি আজ চিন্তিত। আজকাল উমাকান্তের

শিল্পীজীবনের পসার এবং নাম কোনটারই তো অভাব নেই। প্রথম শ্রেণীর সম্মানে সম্মানিত কলাশিল্পী উমাকান্ত। পারিবারিক চিন্তারও কোন কারণ নেই। সে একা। বিষণ্ণতার কোন কারণই থাকতে পারে না তার।

'তোমার আবার কিসের চিন্তা?' তার চোখে চোখ নিবদ্ধ করে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করি।

'এক মহিলা সম্পর্কে ভাবছি।' হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে এল। আমি চমকে উঠলাম। উমাকান্ত কোন মহিলার প্রেমে পড়েছে এটা ভাবতেও কেমন লাগে। মহিলাদের সম্পর্কে তার অদ্ভুত জঘন্য মনোভাবের জন্য, তাদের সম্পর্কে কথা পাড়লে উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হত। একবার এক মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে কোন একটা কাজে স্টুডিওতে এসেছিল। সে চলে যাওয়ার পর উমাকান্ত আমাকে বলে, 'মহিলাটির বুক অস্বাভাবিক চওড়া।' কথাটা শুনে দুটো কড়া কথা শুনিয়েছিলাম তার এই কদর্য মন্তব্যের জন্য।

'আজ্ঞে না, এসব স্রষ্টার অজ্ঞতা। সৃষ্টির আগে তার উচিত ছিল সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করা।'

মহিলাদের সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাব যার সে তাদের সম্পর্কে চিন্তিত—এ কথা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

'তুমি যে আবার কোন দিন এদিকেও চিন্তা করতে শুরু করে দেবে ভাবতেও পারিনি?'

'কোন্ দিকে?'

'এই প্রেম-টেমের দিকে আর কি।'

'প্রেম!' উমাকান্ত ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'তোমাদের মগজে ঐ প্রেম ছাড়া দেখছি আর কিছু নেই। আরে ওদের সঙ্গে প্রেম করার আছেটা কি?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলে, 'আসলে সম্প্রতি একটা ভালো

ছবির অর্ডার পেয়েছি।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম। সে বলল, 'অর্থ এবং সন্মানের দিক দিয়ে কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

তারপর জানতে পারলাম, ছবিটা বিদেশের কোন এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠাতে চায় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত এই কলাদক্ষ।

শুনেই সোল্লাসে বললাম, 'বা! তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট মুখে সে বলল, 'চুলোয় যাক তোমার অভিনন্দন! আমি এখন ঐ ছবির চিন্তায় হিমশিম খাচ্ছি!'

'কিন্তু তুমি তো বললে, কোন এক মহিলা সম্পর্কে চিন্তা করছ।'

'তা তো করছিলাম। কিন্তু একটা ভালো মডেলের ছবি আঁকতে একটি ঐ ধরনের মহিলার মুখও তো নজরে পড়া চাই।'

'এটা আর এমন কি শক্ত ব্যাপার!' আমি তাকে চটানোর জন্যই বললাম। 'তোমাদের পরিচিত যত মহিলা আছে। প্রায় প্রত্যেকের মুখটাই তো এক একটা মডেল!'

আমার কথায় কান না দিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বকতে বকতে উমাকান্ত জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু শুনতে পেলাম, 'আমি ঠিক যে মডেল চাই তা পাচ্ছি না।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, 'কেন, তোমার প্রত্যেকটা ছবিই তো এক একটা মডেল।'

'ও সব মডেল মাসিক পত্রিকার বুকেই মানায়। আমাকে আঁকতে হবে সীতার ছবি!'

'সেটা আর এমন কি! চোখ বুজলেই সীতার ছবি!'

যেমন তেমন সীতার ছবি হলে তো হবে না। আঁকতে হবে অশোকবনের সীতাকে। অর্ডারটাই ঐ ধরনের। এদিকে সময়ও আর বেশি হাত নেই। তিন চার দিন কেটে গেল, এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না কোন্ মডেল আঁকব। অথচ...'

কথা শেষ না করেই উমাকান্ত চুপ করে গেল। তার চোখ জানালার বাইরে কোন কিছুর উপর নিবদ্ধ। আমার উপস্থিতিও যেন

সে ভুলে গেছে। দীর্ঘ পাঁচ মিনিটের পর হঠাৎ বলল, 'তাড়াতাড়ি, এই এসো না তাড়াতাড়ি এদিকে!'

আমি উঠে তার কাছে দাঁড়ালাম। তার চোখ যেদিকে নিবদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে দেখি একটি গাড়ির পাশে দামী পোশাক পরাইতা দুটি যুবতী। পিছনে দাঁড়িয়ে এক ভিখারিনী জ্বালাতন করছে তাদের। অদূরে দুজন লোক দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সব দেখে ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'কী আছে ওখানে?'

'সীতা। সীতাকে পেয়েছি!' উমাকান্ত লাফাতে লাফাতে এমন ভাবে বলল যেন সে 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলে চিৎকার করতে চায়!

'তাই নাকি! কে সে, বব-কাট তরুণীটি?'

'কী বেরসিক লোক তুমি। আরে ওকে খুব জোর সীতাকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাক্ষসীদের মধ্যে রাখা যেতে পারে!'

'তাহলে কি তার সঙ্গিনীটি?'

'না, সেও নয়! তৃতীয়টি! হ্যাঁ, ঐ ভিখারিনী!'

আমি হো হো করে হেসে উঠি। উমাকান্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'হেসে উড়িয়ে দিও না। আমার মানস পটে সীতার যে ছবি আঁকা আছে তার সঙ্গে এর মিল খুব বেশি। এবার আমার ছবি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব। তুমি চট করে গিয়ে ওকে ডেকে আনো তো।'

আমি বাইরে গিয়ে ঐ ভিখারিনীকে কাছে ডাকি। সে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়।

'তুমি পয়সা চাও?'

আমার দিকে দু-এক পলক দেখে বলে, 'হ্যাঁ বাবু।'

'আমার সঙ্গে ঐ ঘরে চলো, অনেক পয়সা পাবে।'

আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হেনে বলে, 'ওসব আমি বুঝি বাবু। চাই না আমি আপনার পয়সা। আমি যাব না ঐ ঘরে।'

বেশ বুঝলাম যে সে আমার কথার কদর্থ করেছে। তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'দেখ, তুমি যা ভাবছ ও সব কিন্তু নয়। ওখানে যাওয়ার

পর সব বুঝিয়ে দেব। সব কথা শুনে রাজী হলে বলবে, না হলে জোর করব না।'

আমার উপর তার চোখ নিবদ্ধ। সন্দিহান দৃষ্টিতে সে বলল, 'কত পয়সা পাব?'

'পয়সা কি—টাকা। কুড়ি, পঁচিশ—পঞ্চাশ টাকাও পেতে পার।'

হয়ত তখনও তার পুরো বিশ্বাস হয়নি। তবু আমার গাম্ভীর্য দেখে ঝুঁকি নিয়েই হয়ত আমার সঙ্গে যেতে সে রাজী হয়।

উমাকান্ত অধৈর্য হয়ে ঘরে পায়চারি করছে। ভিখারিনীকে দেখেই চিৎকার করে বলে ওঠে, 'বা! পেয়েছি! ঠিক যেমনটি চাই—'

'তা না হয় হল, কিন্তু এখনও তার সঙ্গে কাজের কথা কিছু হয়নি। জানিনা রাজী হবে কি না!'

'রাজী হবে না কেন? এক একটা পয়সার জন্য তো ওকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। আমি তাকে যত টাকা দেব তত টাকা ওর বাবাও হয়ত একসঙ্গে দেখেনি!'

ভিখারিনী দরজায় হেলান দিয়ে উমাকান্তের বক্তৃতা শুনছিল। শেষের কথাটি সে মনে গেঁথে রাখে। বাপ তুলে কথা বলাতেও সে অপমান বোধ করেনি। তার চোখেমুখে আনন্দের আভাস।

'বোসো এখানে।' কাছের চেয়ার দেখিয়ে বলি। সে একবার ঐ চেয়ারের দিকে তাকিয়ে উমাকান্তকে এক ফাঁকে দেখে নেয়। চেয়ারে বসার অনিচ্ছা থাকলেও হয়ত টাকার লোভেই সে বসল সসঙ্কোচে। আমি বসলাম অন্য এক চেয়ারে।

'তুমি দেখছি, একটা গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করছ।' উমাকান্ত বিরক্তিভরে বলল। ঐ ভিখারিনীর প্রতি অতখানি সম্মান প্রদর্শন তার ভালো লাগেনি। তার ধারণা টাকাতে সব হয়। অত সম্মানের প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, তা তুমি বলতে পার। তবে দেখো, ব্যবহারের উপরেই সব নির্ভর করে। যতই হোক, তার সম্মতির উপর সব নির্ভর করছে।' উমাকান্ত চুপ করে গেল।

আমি ঐ ভিখারিনীকে বলি, 'দেখ, এই ভদ্রলোক একজন নাম করা চিত্র শিল্পী।'

'চিত্রোশিল্পী মানে কী বাবু?' উমাকান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাকে সে জিজ্ঞেস করে।

'চিত্রশিল্পী মানে যিনি ছবি আঁকেন। এই যে এত ছবি দেখছ, সবই এঁর হাতে আঁকা। এখন তোমার ছবি আঁকতে চান। বুঝেছ?'

'আমার ছবি? মানে ফোটু? না বাবু, আমার কাছে পয়সা নেই। আমার ফোটুর দরকার নেই।' সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

উমাকান্ত মনে মনে খুব চটে যায়।

আমি বুঝিয়ে বলি, 'আরে তোমাকে পয়সা দিতে হবে না, উলটে আমরাই তোমাকে টাকা দেব।' সে আবার বসল চেয়ারে।

'কত টাকা দেবেন?'

'একশো টাকা দেবো। কাজ ভালো হলে আরও পঞ্চাশ দেবো।'

'মাগো! এত টাকা দেবেন কেন?"

'তোমার ছবির জন্যে। এবার বলো, আসবে?'

উমাকান্ত জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আসব।' সে মাথা দুলিয়ে বলল।

'পাঁচদিন আসতে হবে। হঠাৎ কামাই করলে চলবে না।'

'আসব। পাঁচ দিন কেন দশ দিন আসব।'

উমাকান্ত তাকে পঁচিশ টাকা অগ্রিম দেয়। টাকা নেওয়ার সময় তার হাত কাঁপল। আনন্দে সে বলল, 'আজ বাচ্চাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারব। ওষুধ কিনতে পারব।'

'ঠিক এইভাবে প্রত্যেকদিন পঁচিশ টাকা করে পাবে—পাঁচ দিন। প্রত্যেক দিন এসো।'

'আসব বাবু, ঠিক আসব।' ভিখারিনী হাতজোড় করে উত্তর দেয়। উমাকান্তকে আর একবার নমস্কার দিয়ে চলে যাওয়ার সময় উমাকান্ত ডাক দিয়ে বলে, 'আরে সীতাবাঈ, তুমি ঠিকানাটা দিয়ে যাও।'

'আমি স্টেশনের ওপারে পুলের নিচে থাকি। কিন্তু বাবু, আমার নাম তো সীতা নয়!'

'তা আমি জানি। তোমায় দেখে দেখে সীতার ছবি আঁকতে হবে। তাই তোমাকে সীতা বলে ডাকলাম।'

'ফোটু কি আমার হবে না?'

'হ্যাঁ, তা হবে বটে। ব্যাপার কি জান—তোমার ছবি হবে সীতার। সীতার মুখটা হবে তোমার মুখের মত।'

'কোন্ সীতার কথা বলছেন ববু?'

'রামায়ণের সীতা। রাবণ যাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ছিল—সেই সীতা! বুঝেছ? তোমাকে পাঁচদিন সীতার মত বসতে হবে।'

শুনে ভিখারিনী চুপ করে গেল। অপ্রত্যাশিত এক গাম্ভীর্য তার মুখে সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ পর সে আবার ঘরে ঢুকল।

'আবার কী চাও?' উমাকান্ত বিরক্তির স্বরে বলে।

বিড়বিড় করে ভিখারিনী বলে, 'আমি কিচ্ছু চাই না বাবু। এই নিন টাকা' টাকাগুলো সে রেখে দেয় উমাকান্তের সামনে।

'কেন! কী হলো?' আমরা তুজনে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি রামায়ণের সীতা হব? না! না!' সে যেন স্বপ্নে কথা বলছে।

'আরে না হয় তুশো টাকা দেবো।' উমাকান্ত প্রলোভন দেখায়।

'না বাবু।' মাথা নেড়ে সে বলে, 'তাল তাল সোনা দিলেও না। আমি সীতা হতে পারব না। কত পাপ করেছি। আমি পাপিনী। সীতা আমি হতে পারব না।'

'আরে চারশে টাকা দেবো।' উমাকান্ত যেন শেষ চেষ্টা করল।

সে নীরব অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। দারিদ্র্যে থেকে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার দ্বন্দ্ব। এতগুলি টাকা দিয়ে সে নতুনভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। শেষ পর্যন্ত প্রলোভন দেখিয়েও তাকে টলানো গেল না।

'আমাকে মাপ করুন বাবু। আমি এই কাজ করতে পারব না।' ভিখারিনী ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শৃঙ্খল

শান্তারাম সবনীস

বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি এক নতুন জগতে ঢুকলাম। আমার আশে পাশে অনেক লোক ঘুমন্ত ছিল। নানা ধরনের লোক। চিকিৎসালয়ে আসার পর থেকে অনেক অবিস্মরনীয় লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো।

এক বুড়ো জমাদার—। মরার আগে পর্যন্ত বিড়ির একনিষ্ঠ প্রেমিক। সে বলতো, জীবন যায় যাক কিন্তু একে ছাড়তে পারবো না।

আমার সামনের খাটে পেট ব্যথায় পড়ে থাকা এক মারওয়াড়ী কোঁকাচ্ছিল। লোকটা ঠেসে খেতে চায়।

তার খাদ্য হাসপাতালেই তৈরি হতো। তার উপর সে বাড়ি থেকে তার খাবার আনিয়ে নিত। ওয়ার্ডের এক ছোট বাচ্চার জন্যে আমি বিস্কুট আনিয়ে রেখেছিলাম। সেই বিস্কুটের উপরেও তার নজর পড়তো।

তার অন্যপাশে শুয়েছিল এক তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী। তার সঙ্গে সেই তরুণীর সরস আলাপ চলতো।

এইভাবে হাসপাতালে এক মাস থাকাকালীন নানা মতের নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

রুগী, নার্স ও ডাক্তারের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া গেল। হাসপাতালের এই ক্ষুদ্র জগতে অনেক করুণ, হাস্যাস্পদ, মধুর এবং বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা সেই বাচ্চা মেয়ে, সেই কুসুম এবং আমার বৃদ্ধ ও রুগ্ন বাবার সেই জরাগ্রস্ত স্নেহময়ী মূর্তি। কিন্তু এইসব কিছু ছাড়াও আমার মনে যদি

কেউ গভীর দাগ কেটে থাকে তো সে হলো সদাশিব। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো এক কৌতুকময় অবস্থার মধ্যে। অপারেশন করানোর দুদিন আগে আমি হাসপাতালে প্রবেশ করেছিলাম। সেই যন্ত্রণার কাল থেকে সদাশিব কয়েকদিন আগেই পেরিয়ে গিয়েছিলো। কাজেই ভুক্তভোগী আর সহানুভূতি শীল মনোভাব নিয়ে সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে সুরু করলো।

'মশাই, অপারেশনের ব্যাপারে একটুও ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। ওতে মোটেই যন্ত্রণা হয় না। হ্যাঁ, তবে তার এক দিন আগে পেছন দিক দিয়ে পেটে টিউবের সাহায্যে জল ঢোকানো হয়, ব্যস ঠিক সেই সময়টাই যা একটু ব্যথা লাগে।'

এই কথা শুনে আমার একটু হাসি পেল। 'এর প্রয়োগতো আমি নিজেই কয়েকবার করেছি।' আমার এই কথা শুনে সে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব বাড়লো।

সদাশিবের উপর আমার এত কৌতুহল ছিল যে বলার নয়। তার অবশ্য মূল কারণ সে ছিল এক কয়েদী। দোলের দিনে মদ খেয়ে সে এক কালালের (মদ বা তাড়াতাড়ি বিক্রেতার পদবী কালাল) মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। কাজেই তাকে জেলে পাঠানো হলো।

সদাশিবের সঙ্গে গল্প করার সময় মনে হত আমি যেন এক নতুন দুনিয়ায় আছি।

সেই দিনগুলিতেই বুঝলাম যে মানবিকতা কেতাবী শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে না। সদাশিবের মমতা লক্ষ্য করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি।

আমার পাশের খাটে আট বছরের এক ছেলে ছিল। তাকে দেখার জন্য তার বাবা রোজ সন্ধ্যায় আসতো। বাকি সময়টা বেচারা একলাই থাকতো। তার গরীব বাবা কারখানায় রাত্রে কাজ করতো।

'দয়া করে আমার ছেলেটার মশারী রাত্রে একটু ফেলে দেবেন।' নিজের মনকে কঠোর করে নিয়ে আশেপাশের রুগীদের এই আবেদন করে চলে যেত। এই ছেলেটাকে সব রকম দেখাশোনার ভার সদাশিব

নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। কারণ সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আজকাল চলাফেরা করতে পারে। মাঝে মাঝে এমন কি মধ্যরাত্রেও সদাশিব এই ছেলেটাকে জল ইত্যাদি দিত। তার এই আগ্রহ এবং তৎপরতা দেখে করো মনে আশ্চর্য লাগা বা কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। রাত্রে মাত্র একজন নার্স থাকতো। আর তার ঘাড়েও কাজের বোঝার অভাব নেই। কাজেই সামান্য কাজে তাকে কষ্ট দিতে কারো ভাল লাগতো না। সদাশিবের উপর পুলিশের পাহারা মোতায়েন থাকলেও কয়েদী অসুস্থ থাকায় তার বিশেষ কোন দায়িত্ব ছিল না। কাজেই সে ঝিমোত। তা ছাড়া সদাশিব হচ্ছে জেলখানার পুরোন 'বাসিন্দা'।

'আমার ছেলেটাও আজ হয়তো এত বড়ই হয়েছে। আমার জেলে আসার সময় তার বয়স ছিল এক বছর। না জানি আজ সে কোন অবস্থায় আছে।' এই সব কথা বলতে বলতে ঐ ছেলেটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতো। এতে আমার মন খুব নাড়া পেত। ঐ বাচ্চাটার জন্যেই আমি বিস্কুটের কৌটো আনিয়েছিলাম। আর এই কৌটোকে কেন্দ্র করেই সদাশিব আর সেই মারওয়াড়ীর মধ্যে একটা গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। 'এই পয়সাওলা লোকেরাতো এই ধরনেরই হয়। ভুরি ভুরি গিললেও শিশুর বিস্কুটের দিকেই এদের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। সেই ব্যাটা শ্রীপত কালালও এই ধরনেরই ছিল। ও তড়িতে জল না ঢাললে আমি কেন ওর মাথাটা ফাটাতাম। আজ কেন এই পাথর ভাঙা জীবন কাটাতাম।' সদাশিব বলল।

এইসব কথার জের টেনে সে নিজের গ্রামের অন্যান্য লোকের সম্পর্কেও কথাবার্তা পাড়তো। শ্রীপত সম্পর্কেও সে আত্মীয়তার মনোভাব পোষণ করতো। 'এই শ্রীপততো আমার নিবিড় বন্ধু ছিল। আমাদের বয়সও খুব বেশী তফাৎ ছিল না। আমার মায়ের কোলে বসে দুধ খাওয়ার সময় সে সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতো।' এই কথা শুনে আমি তাদের বয়সের পার্থক্য অনুমান করতে না পারলেও তার কথা আমি সাগ্রহেই শুনতাম।

'আমরা দুজনে এক আখড়ায় যেতাম। এমনিতেতো সে পরের জন্যে জীবন দেওয়ার মত লোক ছিল। তার মারা যাওয়ার পর আমারই বেশি কান্না পেল। কিন্তু—' এটুকু বলে সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে তারপর শ্রীপত বেশি টাকা চুকিয়ে দোকানের ঠিকা কি ভাবে পেল ইত্যাদি কথা শোনাতে লাগালো।

'আমি কি আর কোনদিন মদ খাওয়ার লোক ছিলাম! কিন্তু তাই বলে আমি তো আর এখন মুসলমান হয়ে যাইনি যে দোলের উৎসবের দিনেও মদ খাব না।'

তার এই ধরনের কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে যেত। কিন্তু হাসি চেপেই আমি তার কথা শুনতাম। সে এমন সুন্দর গাল্পিক ছিল যে আমার সময় বেশ আনন্দেই কেটে যেত। কিন্তু একটি রাত্রে যে ঘটনা ঘটলো তার জীবনে, তা আমার মনে খুব গভীর দাগ কেটে আছে।

একদিন সদাশিবকে পাহারা দেওয়া লোকটা বদলী হয়ে গেল। পাহারা দেওয়ার জন্যে এলো অন্য একটা সেপাই। সে এসেই সদাশিবকে তার নিজের অধিকার স্মরণ করিয়ে দিল। পুরাণো সেপাই সদাশিবের সঙ্গে আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার করতো! এই নতুন সেপাইতো এসেই সদাশিবকে মনে করিয়ে দিল যে সে কয়েদী! সদাশিব তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে হুমকি দিয়ে বলতো, 'বক্‌বক্ বন্ধ কর।' এর পরেই দেখাতো নিজের ডাঁট। সদাশিব অবশ্য তার হুমকিকে বিশেষভাবে অনুভব করেনি। তবে হ্যাঁ কথাবার্তাগুলো একটু আস্তে বলতো। সেই সময় আমি লক্ষ্য করলাম সেই মারওয়াড়ীর মুখে মুচকি হাসি।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হলো। ওয়ার্ডের সমস্ত আলো নেভানো হলো। শুধু একটি মাত্র আলো ছিল জ্বলন্ত। তার অস্পষ্ট আলোতে আশেপাশের জিনিস দেখা যাচ্ছিল। একে একে সমস্ত রোগী ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কিন্তু নিদ্রাহীন হয়ে পড়েছিলাম। মধ্যরাত্রে সদাশিব

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই ছেলেটাকে জল খাওয়াতে গেল। ঠিক সেই সময়েই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি তাকে দেখতে পেলাম। ছেলেটার শরীর জ্বরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। সে একনাগারে 'জল, জল' বলে চিৎকার করছিল। তারপর সকাল ঠিক পাঁচটার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ মেলেই দেখতে পেলাম সদাশিবের নির্বিকার কঠোর চেহারায় নেমে এসেছে দুঃখের করাল ছায়া।

'কী ব্যাপার সদাশিব, কি হলে ?' জিজ্ঞাসা করার পর সে নিজের লোহার শিকল ঘড়ঘড় করে নাড়লো। ভালভাবে জেগে দেখলাম সদাশিবের পায়েপরানো আছে শৃঙ্খল !

'কী ব্যাপার, আজ সেপাই হঠাৎ শেকল পরিয়ে দিল কেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, 'সেই ছেলেটা রাত্রে জল জল বলে চিৎকার করছিল। বেচারা জ্বরে ছট্‌ফট করছিল। তাকে দুতিনবার জল খাইয়েছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও একবার জেগে উঠেছিলাম। তারপর ?'

'সেইটাই সেপাই সাহেব দেখে নিয়ে রাত্রে আমি যাতে পালাতে না পারি তার জন্যে আমাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে।'

'কিন্তু তোমার মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার শক্তিই যাব কোথায় ? এখনওতো সুস্থ হতে অনেক দেরি আছে।'

'আমিওতো সেই কথাই বলছি যে পালিয়েই বা আর কোথায় ? ঐ বাচ্চটার অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তাকে জল খাওয়াচ্ছিলাম, কিন্তু ..'

অত্যন্ত করুণভাবে সে আমার কাছে আবেদন করল, 'আপনি সেপাইকে একটু বলে দেখুন না ! এই ছেলেটার সেবা করতে আমার মন খুব চায়।'

এই ধরনের কথা বলতে বলতে তার মুখমণ্ডলে এমন কোমল ভাব প্রতিফলিত হলো এবং একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব বলে অনুভূত হলো যে এই মানুষটির হাতে কোনদিন কোন লোক খুন হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর আমি রাত্রের ঘটনা নার্সকে বলি। সেই নার্স ডেকে পাঠালো সেপাইকে।

সদাশিব কী ভাবে নিজের ছেলেকে মনে রাখে, তার মন এই ছেলেটার জন্যে কী ভাবে গুমরে ওঠে, আর ছাড়া পেলেও পালিয়ে যাওয়ার অবস্থা নেই; শুধু এই ছেলেটাকে সেবা-শুশ্রূষা করার মধ্যেই সে আনন্দ পায়। এই সব কথা নার্স এবং আমি সেপাইকে বলি এবং তার পায়ের শেকল খুলে ফেলার জন্যে আবেদন করি।

কল্পনাতীত একাগ্রতায় সেপাই আমাদের কথা শুনলো। হয়তো নার্সের যৌবনের আকর্ষণেও হতে পারে। যাই হোক—আমার অন্তত দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হলো যে সে আমাদের কথা রাখবে।

'রাত্রে দেখব।' বলে সে চলে গেল।

আমি আর সদাশিব গোধূলিবেলার প্রতীক্ষা করছিলাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই সেই সিপাই শেকল নিয়ে এলো। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'আবার কেন তাকে শেকল পরাচ্ছ?'

সে বলল, 'মশাই, আপনার কথাই ঠিক। আমি এ বিষয়ে খুব চিন্তা করেছি। আমারও দেশে ছেলেমেয়ে আছে। আজ যদি সদাশিবের মনে নিজের ছেলের স্মৃতি তীব্র হয়ে ওঠে, আর সে যদি পালাতে চেষ্টা করে তো আমার বউ ছেলের অবস্থা কি হবে? আমার মধ্যেও মানবিকতা আছে কিন্তু…'

এই কথা বলে মুহূর্তকাল দেরি না করে সদাশিবের পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে দিয়ে সে বাইরে চলে গেল। সদাশিব চোখ বুজে পড়ে রইলো।

ক্রমশ কপালে তার চিন্তার রেখা পড়ছিল।

+ +